আমার সালাত ছুটে গেল!

ইসলাম জামাল

ছোটবেলায় বড়রা আমাদের সালাতের আদেশ দিতেন। তাদের কথা মতো আমরা সালাত পড়তে যেতাম। সালাত আমাদের অনেক ভারি মনে হতো। তাই আমরা সালাত ছেড়ে দিতাম!

বড় হওয়ার পর কখনো শাইখদের মুখে সালাতের গুরুত্ব ও সালাত পরিত্যাগের শাস্তি নিয়ে আলোচনা শুনি। তখন আবার সালাত পড়তে যাই। সালাত আমাদের অনেক ভারি মনে হয়। তাই আমরা আবার সালাত ছেড়ে দিই। সালাতের ব্যাপারে আমরা হৃদয়ে যে অনীহা অনুভব করি, যারা আমাদের সালাতের আদেশ দেন, তারা হয়তো এমন অনীহা অনুভব করেন না—আমাদের মতো সালাত বোধহয় তাদের কাছে এতটা ভারি মনে হয় না। খুব সম্ভব তারা আল্লাহর কাছ থেকে বিশেষ কোনো অনুগ্রহ পেয়ে ধন্য হয়েছেন, যা আমরা পাইনি।

আমরা দিনের পর দিন প্রতীক্ষায় থাকি, কবে আল্লাহর পক্ষ থেকে সেই অনুগ্রহ আসবে। এদিকে একের পর সালাত ছুটে যেতে থাকে।

বলুন তো এমন কেন হয়?

এই বইতে আপনি জানতে পারবেন এই প্রশ্নের উত্তর। আরও জানতে পারবেন কীভাবে আপনি সালাতে নিয়মিত হবেন।

আমার সালাত ছুটে গেল!

ছোটবেলায় বড়রা আমাদের সালাতের আদেশ দিতেন। তাদের কথামতো আমরা সালাত পড়তে যেতাম। সালাত আমাদের অনেক ভারী মনে হতো। তাই আমরা সালাত ছেড়ে দিতাম!

বড় হওয়ার পর কখনো শাইখদের মুখে সালাতের গুরুত্ব ও সালাত পরিত্যাগের শাস্তি নিয়ে আলোচনা শুনি। তখন আবার সালাত পড়তে যাই। সালাত আমাদের অনেক ভারী মনে হয়। তাই আমরা আবার সালাত ছেড়ে দিই।

সালাতের ব্যাপারে আমরা হৃদয়ে যে অনীহা অনুভব করি, যারা আমাদের সালাতের আদেশ দেন, তারা হয়তো এমন অনীহা অনুভব করেন না—আমাদের মতো সালাত বোধহয় তাদের কাছে এতটা ভারী মনে হয় না। খুব সম্ভব তারা আল্লাহর কাছ থেকে বিশেষ কোনো অনুগ্রহ পেয়ে ধন্য হয়েছেন, যা আমরা পাইনি।

আমরা দিনের পর দিন প্রতীক্ষায় থাকি, কবে আল্লাহর পক্ষ থেকে সেই অনুগ্রহ আসবে। এদিকে একের পর এক সালাত ছুটে যেতে থাকে।

বলুন তো এমন কেন হয়?

কারণ আমরা সমস্যার মূল চিহ্নিত করিনি। আর তা হলো, 'সালাত কেন আমাদের কাছে ভারী মনে হয়?'

-ইসলাম জামাল

সূচিপত্র

আমার সালাত ছুটে গেল!

কয়েক বছর ধরে দেখছি বৃদ্ধ লোকটিকে। বয়স প্রায় আশির মতো হবে। আজানের আগের লাগোয়া সময়টাতে তাকে রাস্তায় উদয় হতে দেখা যায়। আজানের কয়েক মিনিট আগেই বেরিয়ে পড়েন তিনি। খুবই পরিচিত একটি দৃশ্য : লাঠিতে ভর দিয়ে এক বৃদ্ধ আপন মনে এগুচ্ছেন মসজিদের দিকে। যখনই তাঁর কথা মনে পড়ে, ধীরস্থির, শান্ত-সৌম্য, হাস্যোজ্জ্বল এক সুখী বৃদ্ধের অনুপম ছবি ভেসে ওঠে হৃদয়ের রুপোলি পর্দায়।

তাকে দেখে মনের ভেতর লজ্জায় ও আক্ষেপে ভরা এক গাদা প্রশ্ন এসে ভিড় করে। কিন্তু পরক্ষণেই রকমারি অজুহাতেরা এসে সেসব প্রশ্নের টুঁটি চেপে ধরে—মলিন করে তোলে লজ্জা ও অনুশোচনাগুলোকে।

কখনো কখনো আমি ফিরে এসে দেখি, সালাতের পরে তিনি কী করেন। তেমনই একবার রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখি, বৃদ্ধ লোকটি সালাত আদায় করে বাড়ি ফিরে যাচ্ছেন—পথে প্রতিবেশীদের সালাম দিচ্ছেন। তখনই আমার সালাতের কথা মনে পড়ে। দ্রুত আমি হাতের ঘড়ির দিকে তাকাই। সাথে সাথে সেই অজুহাতটি মনে উদিত হয়, যেটি প্রায়ই সালাতের আগের সময়টাতে আমার অন্তরে হানা দেয়, 'আমার অমুক কাজ আছে; সেটা শেষ করেই সালাত আদায় করছি।'

নিজেকে প্রশ্ন করি, আসলেই কি সালাতের সময়টাতে আমি গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজে ব্যস্ত ছিলাম?! যদি থাকিও কয়েক মিনিটের জন্য সে কাজ

থেকে বিরতি নিলে ক্ষতি কী?! পরক্ষণেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অজুহাত আর মন ভুলিয়ে দেওয়া উত্তরসমূহ আমার মনে উদয় হওয়া প্রশ্নগুলোকে থামিয়ে দেয়। পুরো দিন বিভিন্ন অনর্থক কাজে লেগে থাকলে সে সময় এসব অজুহাত আসে না। কেবল সালাতের আগে আসে আর সালাতের সময় গড়িয়ে গেলে আমাকে দীর্ঘ নীরবতা আর শূন্যতার মাঝে রেখে সেসব অজুহাত হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। বাইরে এক প্রগাঢ় স্থিরতা আর নীরবতা; কিন্তু ভেতরে শুনতে পাই একঝাঁক অনুশোচনার অসহ্য চিৎকার—'হায়, আমার সালাত ছুটে গেল!'

সে লোকটির লাঠির ঠকঠক মধুর শব্দ কত বারই তো আমাকে রাতের ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলেছে। ফজরের সালাতের আজান দেওয়ার জন্য লাঠিতে ভর দিয়ে মসজিদের দিকে এগিয়ে যান তিনি। আগে আমি জানতাম না, মসজিদে একজন ইমাম আছেন, যিনি সব ওয়াক্তের আজান দেন, কেবল ফজরের আজানটা এ বৃদ্ধ লোকটির জন্য রেখে দেন।

দিন যায়; রাত আসে; সপ্তাহ গড়ায়। লাঠির ঠকঠক শব্দে কোনো ব্যত্যয় ঘটে না। কনকনে শীত, বৃষ্টির তাণ্ডব কিছুই তাঁকে থামাতে পারে না। এভাবে কেটে যায় বছর, পাল্টে যায় সময়ের হালচাল। কিন্তু লাঠির ঠকঠক শব্দ আমাকে জাগিয়ে তোলার কাজটি ঠিকই করে চলে। যখনই ঘুম থেকে জেগে উঠি একঝাঁক অজুহাত এসে আমাকে ঘুম পাড়ানি গান শোনায়। আমাকে বোঝায়, তর্ক করে। অবশেষে সর্বাঙ্গে অজুহাতের চাদর টেনে ঢলে পড়ি গভীর ঘুমের কোলে।

নফস আমাকে এই বলে সান্ত্বনা দেয়, লোকটি আসলে রাতে ঘুমায় না। সারা রাত জেগে থাকে। ফজর পড়েই ঘুমায়। সে হয়তো বিশেষ ধরনের কোনো চাকুরি করে। তাই ভোরে কাজের জন্য তাকে কোথাও যেতে হয় না—ধুমসে ঘুমায়। কাউকে জবাবদিহিও করতে হয় না। তাই সে এত বছর ধরে অনায়াসে ফজরের সালাত নিয়মিত আদায় করতে পারছে। কিন্তু আমাকে তো স্টাডি করতে হয়, এরপর ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে ক্লাস করতে হয়। এরপর আবার কাজ করতে হয়। এটিই ছিল কয়েক বছর ধরে আমার শ্রেষ্ঠ অজুহাত! যখনই আমার মন এসব অর্থহীন অজুহাতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, আমি মনকে এ

বলে প্রবোধ দিই—'আরে, অত টেনশনের কিছু নেই। সময় আসুক, আমি নিজেকে ঠিক গুছিয়ে নেব। সালাতে নিয়মিত হব।'

অবশেষে এক দিন সে ক্ষণটা আসে, আমি সে বৃদ্ধকে তার চাকরি ও রুটিন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি। তিনি জানান, আমি যেমনটা ভাবতাম, তেমনটা মোটেও নয়। তিনি ফজর পর্যন্ত জেগে থাকেন না। বরং তার কাজের কারণে তার ঘুমোতে যেতে বেশ রাত হয়ে যায়। তা সত্ত্বেও অল্প কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়ে তিনি ফজরের আজান দেওয়ার জন্য জেগে ওঠেন।

এবার আর আমার নফসের হাতে কোনো অজুহাত বাকি থাকে না। তর্কে সে সুবিধা করতে পারে না। পরের দিনের ফজর আমার জন্য নতুন ফজর হওয়ার কথা ছিল। কথা ছিল আমি সালাতে যাব। কিন্তু নফস আমাকে তখন ফিসফিস করে বলে, 'এটি আল্লাহপ্রদত্ত গুণ, বিশেষ অনুগ্রহ—যাকে ইচ্ছে তিনি দান করেন। একদিন আল্লাহ তোমাকেও হিদায়াত দেবেন।' আমি আবারও নিদ্রার মাঝে ডুবে যাই। যথারীতি আমার সালাত ছুটে যায়।

অনেক বছর ধরে কঠোর পরিশ্রমী বৃদ্ধকে অবলোকন করি। তার মুখের হাসি কখনো ম্লান হয় না। যখনই তার দিকে তাকাই, তাকে বেশ সুখী মনে হয়। তার দর্শন আমার ভেতর ইতিবাচক শক্তি সঞ্চার করে। আজান শোনামাত্র তিনি দোকান বন্ধ করে দেন। শান্ত পদে মসজিদের দিকে অগ্রসর হন।

যে ক'বার আমি মসজিদে গিয়েছি, লক্ষ করেছি তিনি অজু করে দেয়ালের পাশে বসে যান। ইকামত হওয়ার আগে কয়েক রাকআত সালাত পড়ে নেন। কিন্তু সেটা স্রেফ সালাত বললে ভুল হবে। কারণ তার সালাত ছিল অনন্যসাধারণ। তার সালাত যেন বান্দা ও রবের মাঝে মধুর সাক্ষাৎ। মালিক ও গোলামের মাঝে ভালোবাসার অপূর্ব কিছু মুহূর্ত। সালাতের ভেতরে তার হালকা কান্নার সুর আমি শুনতে পাই। আমিও তার মতো হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করি। তার প্রতি ঈর্ষা জেগে ওঠে আমার মনে।

যখন তিনি সালাতে থাকেন, মনে হয় পুরো মসজিদে তিনি একা। কোনো কিছুর খেয়াল নেই তার। সালাতে ডুবে আছেন আপন মনে। ধীরস্থির, শান্ত-স্নিগ্ধ আশ্চর্য এক সালাত। অন্যরা যে সময়ে চার রাকআত আদায় করে নেয়,

তিনি আদায় করেন মাত্র এক রাকআত। দীর্ঘ রুকু, দীর্ঘ সিজদা, কাওমা, জালসা—সব মিলিয়ে আশ্চর্য রকম পরিপাটি সালাত।

তাকে দেখে অবাক হয়ে ভাবি, তিনি কি এমন কোনো জিকির জানেন, যা অন্যরা জানে না? আমি তার সালাতকে ভালোবেসে ফেলি। তার মতো করে সালাত পড়তে মনটা আকুল হয়ে ওঠে। কিন্তু পারি না আমি। যত সহজে কাজটি করতে চাই, বিষয়টি অত সহজ নয়। আমি বুঝতে পারি না, কেন এমন হয়। খুব দ্রুত আমি আবার আগের অবস্থায় ফিরে যাই। একের পর এক সালাত আমার ছুটতে থাকে।

কয়েক বছর ধরে আমার মনে অনেক প্রশ্ন ঘুরপাক খেতে থাকে। প্রশ্নগুলোর উত্তর না পেয়ে আমি চিন্তা করতে থাকি। কীভাবে কিছু মানুষ নিয়মিত সালাত আদায় করতে পারে, যেখানে বেশির ভাগ মানুষেরই সালাত ছুটে যায়! এমনকি অনেকে এক ওয়াক্ত সালাতও আদায় করতে পারে না। কেন এমন হয়? এর রহস্য কী? সত্যিই কি এটি এমন বিষয়, যেটাতে আমাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই?! সত্যিই কি এটা এমন গুণ, যা আল্লাহ যাকে ইচ্ছে দান করেন। যদি বিষয়টা এমনই হয়, তাহলে কেন কিয়ামতের দিন সবকিছুর আগে আমাদের সালাতের হিসাব নেওয়া হবে! যদি সালাত এমন কোনো বিধান হয়, যা পালন করার সক্ষমতা নেই, তাহলে কেন সালাত আদায়ের সাওয়াব ও পুরস্কার থাকবে আর কেনই বা সালাত তরক করলে আজাব ও শাস্তি থাকবে!

এসব প্রশ্ন আমার মনের ভেতরটা অস্থির করে তুলছিল দিনদিন। তাই এগুলোর উত্তর খোঁজা আমার জন্য জরুরি হয়ে পড়ে?

নিজের আমলনামায় অগণিত সালাত ত্যাগের বিশাল গুনাহ নিয়ে এ জীবনের অবসান হওয়ার উদ্বিগ্নতা আমাকে অস্থির করে তোলে, আমাকে ভীষণ কষ্টে ফেলে দেয়।

সিদ্ধান্ত নিই, যাদের প্রায় কোনো সালাতই ছুটে না, তাদের গিয়ে জিজ্ঞেস করব। জানতে চাইব, তাদের সালাত না ছোটার নেপথ্যে রহস্য কী।

তা ছাড়া আমি সফল মানুষদের জীবনী পড়ে দেখলাম, যারা নিয়মিত সালাত আদায় করতে সফল হয়েছে এবং যারা বিশেষ অবদান রেখে পৃথিবীতে নিজেদের ছাপ রেখে যেতে সফল হয়েছে, উভয় শ্রেণির বৈশিষ্ট্য ও অভ্যাসে বিরাট মিল রয়েছে।

আজ আমি সময়মতো সালাত পড়ে আমার দিন শুরু করার পর অফিসে বসে ধোঁয়া ওঠা কফির স্বাদ নিতে নিতে এ কথাগুলো লিখছি। জীবনের সে অধ্যায়ের কথা বলছি, যার অনেক বড় প্রভাব রয়েছে আমার জীবনে।

একদিন ভালো হয়ে যাব

আমি মন থেকে চাইতাম আমিও সালাত আদায়ে নিয়মিত হই। আমি জানতাম, যদি আমি সালাতে নিয়মিত হই, তাহলে আমার জীবনটা আরও বেশি সুখ ও সৌভাগ্যে ভরে উঠবে। যারা সালাত পড়ে না, তাদের অনেকেই নিজের কথা আমাকে জানিয়েছে।

একজন বলল, 'তার জীবন কেবল সালাতের ঘাটতির কারণেই অপূর্ণ।' আরেকজন বলল, 'সে অনুভব করে যে, তার জীবনের অনেক সমস্যা সালাতের মাধ্যমে ঠিক হয়ে যাবে।' আমাদের মনের ভেতর সালাতের জন্য এত টান থাকা সত্ত্বেও আমরা সালাত পড়ি না!

আশ্চর্য! সালাত পড়লে প্রশান্তি, সাহায্য ও সৌভাগ্য পাওয়া যায় জেনেও কেন আমরা সালাত পড়ি না?! সালাত শান্তি ও সুখের উৎস জেনেও কেন আমরা সালাতকে ভুলে থাকি?! কেনই বা এখনো আমরা সালাত আদায়কারী হয়ে উঠিনি?!

প্রশ্নটার উত্তর খুঁজতে থাকি আমি। অবশেষে জবাবটা পেয়ে থমকে দাঁড়াই। আমরা এখনো সালাতে নিয়মিত হয়ে উঠতে পারছি না, কারণ আমরা নিজেদের জন্য একটা ভিন্ন জগৎ তৈরি করে নিয়েছি। এ জগৎটার নাম 'একদিন ভালো হয়ে যাব।' যারা সালাত পড়ে না, তাদের অধিকাংশই এ জগতের অধিবাসী।

আমরা যারা এ জগতের অধিবাসী, তারা মনে করি, 'আসমান থেকে এমনিই একদিন আমাদের জীবন, আমাদের অবস্থা ঠিক করে দেওয়া হবে, তারপর

আমরাও সালাতের প্রতি মনোযোগী হব। একদিন আমরাও সালাত আদায়কারী হব।' যখন আমার মনে সালাত না পড়ার আক্ষেপ কাজ করত, তখন আমি এ অজুহাতটা দিয়ে মনকে শান্ত করতাম—

একদিন আমিও ফজর পড়ব...

একদিন আমিও মসজিদে গিয়ে সব ওয়াক্ত সালাত জামাআতের সাথে আদায় করব...

আসন্ন রমাজানে ঠিক ভালো হয়ে যাব, পুরোদমে সালাত পড়া শুরু করব, আর কখনো সালাত ছাড়ব না...

একদিন আমি যেমন চাই, তেমন জীবন পাব...

একদিন ভালো হয়ে যাব, কোনো একদিন... কোনো একদিন... কোনো একদিন...

'একদিন ভালো হয়ে যাব' নামক জগতের অফিসিয়াল ভাষা হচ্ছে অজুহাত। অজুহাতের ভাষায় এখানকার বাসিন্দারা কথা বলে। শত শত অজুহাত আমাকে সালাত না পড়ার কারণ ব্যাখ্যা করে দেয় :

- আমি সালাত পড়ি না, কারণ আমার পেশায় কাজের রুটিন এমন যে, ফজর পড়া সম্ভব হয় না।
- আমাকে বেশ দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করে যেতে হয়, ফলে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়ি—তাই সালাত পড়তে পারি না।
- যদি এক ওয়াক্ত সালাত ছুটে যায়, তাহলে নিজেকে ব্যর্থ মনে হয়। তাই আর সেদিন সালাত পড়া হয় না...
- সালাতে খুশু-খুজু আসে না... তাই সালাত পড়া হয় না।

এমন হাজারো অজুহাত আমাকে সালাত থেকে দূরে রাখছে...

আরও বহু অজুহাত আমাকে সালাত থেকে দূরে রাখছে। সালাত না পড়ার আক্ষেপটা মিটিয়ে দিচ্ছে। তেমনই একটি অজুহাত হচ্ছে এ রকম : কিছু মানুষ সালাতের পাবন্দ থাকতে পারছে, কারণ তাদের শরীর বিশেষ বায়োলোজিকাল গঠনে গঠিত। আল্লাহ আমাকে এমন গঠন দিলে একদিন আমিও ভালো হয়ে যাব আর সালাতে মনোযোগী হব।

আমি সব সময় নিজেকে তাদের থেকে ভিন্ন মনে করতাম, তাদের দল থেকে আমাকে বাদ রেখে ভাবতাম, তাদের সালাতে নিয়মিত হওয়ার বিষয়টা তাদের জন্য খুবই সহজ ও স্বাভাবিক, কোনো রকম কষ্ট ছাড়াই তারা এটা করতে পারে। অন্যদিকে আমার তো সালাত পড়তে বহু কষ্ট ও পরিশ্রম করতে হয়। তাই আমি সেদিনের জন্য অপেক্ষা করতে থাকলাম, যেদিন আমার অবস্থা রাতারাতি পরিবর্তন হয়ে যাবে। একদিন সকালে উঠে আমি দেখব, আমি আর আগের মতো নেই। আমি সালাতে নিয়মিত হয়ে উঠেছি। কিন্তু সেদিন কখনো আসে না!

দীর্ঘ সময় ধরে আমি 'একদিন ভালো হয়ে যাব'-এর জগতে কাটাই। নিজেকে আমি নানান প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে থাকি। কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম সালাতের হিসেব নেওয়া হবে। সালাতে নিয়মিত হওয়া যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ দান ও অনুগ্রহ হয়, তাহলে সালাতের জন্য কেন পুরস্কার ও শাস্তি নির্ধারণ করা হলো!

এখানে রবের ন্যায়বিচার কোথায়?! এসব সালাত আদায়কারী আসমানি সাহায্য পেয়ে সালাত আদায় করতে পারছে, অন্যদিকে আমি কেন আসমানি সাহায্য পাচ্ছি না?!

অবশেষে বুঝতে পারলাম, 'একদিন ভালো হয়ে যাব'র দিনটা কখনো আসবে না। যদি আমি এভাবেই কিছু না করে বসে থাকি, তবে এ অবস্থাতেই আমার মৃত্যু এসে যাবে আর আমি তখনও সে-ই একদিনের অপেক্ষায় থাকব। সালাতহীন আমলনামা নিয়েই আমার জীবনের অবসান ঘটবে। এ বিষয়টি আমাকে সর্বদা পীড়া দিতে থাকে।

বুঝতে পারলাম, আমি যদি সালাত আদায়কারীদের একজন হতে চাই, তাহলে আমাকে 'একদিন ভালো হয়ে যাব'র জগৎ থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। যে দিনটা কখনো নিজ থেকে আসবে না, সে দিনটা আমাকে নিজ প্রচেষ্টায় নিয়ে আসতে হবে।

আমি জানি, যেকোনো পথের প্রথম পদক্ষেপটা কঠিন হয়ে থাকে। আর এ ক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপটা হচ্ছে 'একদিন ভালো হয়ে যাব'র ব্যাপারটাকে মস্তিষ্ক থেকে ঝেড়ে ফেলা। আমরা জানি, বিষয়টা পুরোটাই আমাদের ওপর। যা করার আমাদেরই করতে হবে। 'একদিন ভালো হয়ে যাব'র জগতে থাকা মানে আমরা ভুল পথে আছি। 'একদিন ভালো হয়ে যাব'র মনোভাব পোষণ করার অর্থ হাজারো অজুহাতের চোরাবালিতে নিজেকে আটকে ফেলা। এই জগতে বন্দী থাকার কোনো মানে হয় না। বরং এই কারাগার থেকে মুক্তির মাঝেই সাফল্য।

'একদিন ভালো হয়ে যাব'র জগৎ থেকে বেরিয়ে আসা নিয়মিত সালাত আদায়ের সৌভাগ্য অর্জনের পথে প্রথম পদক্ষেপ। শান্তি ও সৌভাগ্যের জীবন উপভোগের শুরুটা এখান থেকেই হবে। সালাত আদায় না করার পক্ষে হাজারো অজুহাত তৈরির জন্য মস্তিষ্ককে ব্যস্ত রাখার চেয়ে সালাত আদায়ে সাহায্য হয়, এমন সব সহায়ক কাজ ও পদ্ধতি তৈরির জন্য মস্তিষ্ককে ব্যস্ত রাখা অধিক উত্তম। আর এটিই হচ্ছে এ বইয়ের উদ্দেশ্য।

অনেকে মনে করে, কর্তব্য আদায় না করে অবসর থাকা গেলে সেটাই সুখ। তাই এক শ্রেণির মানুষ সালাত আদায়ের ওপর সালাত আদায় না করাকে প্রাধান্য দেয়। তাদের ধারণা সালাত আদায় না করে অবসর থাকলে তারা আরাম ও সুখ পাবে। এভাবে একটি বদ চিন্তা থেকে সালাত না পড়া তাদের অভ্যাস হয়ে দাঁড়ায়।

কিন্তু বাস্তবতা পুরো উল্টো। বাস্তবতা হচ্ছে, সালাত আদায় না করলে যে মানসিক চাপ আমাদের ওপর দিয়ে যায়, সেটা সালাত আদায় করলে যে শারীরিক পরিশ্রম হতো, তার সমান বা তার চেয়ে বেশি হয়ে থাকে। বরং সালাত আদায় করলে শরীর প্রাণবন্ত হয়। ফলে সালাত আদায়ে আরামবোধ

হয় এবং সৌভাগ্য ত্বরান্বিত হয়। অন্যদিকে সালাত আদায় না করলে সংকীর্ণতা চেপে বসে এবং অন্তরের উদ্যম ও সজীবতা নষ্ট হয়।

যে নীতিটি আমাদের ও সালাতের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি করেছে সেটি হলো, কোনো একদিন সালাতে নিয়মিত হব। এই নীতি কখনোই সাফল্য বয়ে আনবে না। কারণ যে পদ্ধতিতে আশানুরূপ ফলাফল আসে না, সেটা বারবার প্রয়োগ করলেও ফলাফল পরিবর্তিত হবে না। তাই সুফল পেতে হলে আমাদের কর্মপদ্ধতি পরিবর্তন করতে হবে।

ধরুন, একটা অন্ধকার ঘরে কিছু মাছিকে আটকে রাখা হলো। কোথাও একটি সামান্য ফুটোও নেই। চারদিকে জমানো দেয়াল। মাছির দল সেখানে থাকতে চাইল না। যখন তারা বের হতে চাইল, আলো দেখা যায় এমন একটা অংশের দিকে ছুটে গেল। আলোর উৎসটা ছিল কাঁচের জানালা। কিন্তু জানালাটি ছিল বন্ধ। মাছির দল সর্বশক্তি দিয়ে কাঁচের ওপর আছড়ে পড়তে লাগল। কাঁচের সঙ্গে টক্কর খেতে খেতে সব মাছি মরে শেষ হয়ে গেল। কিন্তু কাঁচ ভেদ করে আলোর কাছে পৌছতে পারল না।

মাছির দল তার নিজের অবস্থার প্রতি সন্তুষ্ট ছিল না। আলোতে বেরিয়ে আসার জন্য তাদের শরীরে যথেষ্ট শক্তি ছিল। কিন্তু ভুল পথ ও ভুল পদ্ধতি অবলম্বন করার কারণে ব্যর্থ হতে হলো। তেমনই আমি ও আপনারা যদি 'একদিন ভালো হয়ে যাব'র পথ আর অশেষ অজুহাতের পদ্ধতি অনুসরণ করতে থাকি, তাহলে কখনো নিয়মিত সালাত আদায়কারী হতে পারব না। আলোর কাছে আসতে হলে আবদ্ধ ঘর থেকে বের হওয়ার জন্য আমাদের ভিন্ন পথে চেষ্টা করতে হবে।

আসুন, আর অজুহাত নয়। সালাত আদায়ের চেয়ে শত গুণ কঠিন কাজও আপনি করেছেন। সে সময় আপনার শারীরিক ও মানসিক অবস্থা আরও বেশি শোচনীয় ছিল। কিন্তু ঠিকই আপনি তা করতে পেরেছিলেন।

আপনাদের কাছে যে বৃদ্ধ লোকটার গল্প বললাম, তার বয়স ছিল আশি বছর। তার কোনো বিশেষ শারীরিক বৈশিষ্ট্য ছিল না। বরং শারীরিক ও মানসিক শক্তির দিক থেকে তিনি আমার ও আপনার চেয়ে দুর্বল ছিলেন। কিন্তু তা

সত্ত্বেও নিয়মিত সালাত আদায় করতে পারতেন তিনি।

আশি বছর বয়সী বৃদ্ধ বছরের পর বছর ধরে আমার ও আপনার চেয়ে কম ঘুমিয়েও ফজরের সালাতের জন্য উঠতে পারতেন। কম ঘুমানোর কারণে কখনো তার সালাত ছুটেনি। তাই আসুন আর কোনো অজুহাত না দিই।

এ পথের শুরুটা হচ্ছে এ কথা স্বীকার করা যে, পরিস্থিতি যেমনই হোক না কেন আপনি সালাতের প্রতি যত্নবান হবেন। এ পথের শুরুটা হচ্ছে এটা বিশ্বাস করা যে, যারা নিয়মিত সালাত আদায় করেন, তাদের কাছে কোনো বিশেষ ক্ষমতা নেই। এ পথে এসে আপনি এমন কিছু পদ্ধতি ও গোপন কথা জানতে পারবেন, যেগুলো আমি সেসব মানুষের সাথে কথা বলে জেনেছি, যাদের সালাত কখনো ছুটে না। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন আপনাকে তাদের একজন করেন। সালাতময় জীবন সম্পূর্ণ ভিন্ন জীবন। আমরা বাইরে থেকে তাদের যেমন দেখি, তাদের জীবন এ রকম নয়। বরং তারা অনেক সুখী। সালাতময় জীবনে এমন কিছু অনুভব ও উপলব্ধির বিষয় আছে, যা বলে বোঝানো সম্ভব নয়।

সালাত আদায়ের আগে

যেকোনো বিষয়ের গোড়ার কথা জানার চেষ্টা করতাম আমি। কোনো জিনিসকে আমি ততক্ষণ পর্যন্ত বুঝতে পারতাম না, যতক্ষণ না সে জিনিসের শুরুর ইতিহাসটা জেনে নিতাম। যদি আপনি বুঝতে পারেন, প্রথম বিমানটি কীভাবে উড়েছে, তবে আধুনিক বিমান উড্ডয়নের জটিল প্রক্রিয়া বোঝাটা আপনার জন্য অনেক সহজ হয়ে যাবে।

প্রবাদে আছে, প্রতিটি জিনিসেরই প্রাথমিক ধাপ আছে। এ প্রবাদটা আমার খুবই প্রিয়। সালাতের সাথে এ প্রবাদের সম্পর্ক কী? বলছি...

ছোটবেলায় বড়রা আমাদের সালাতের আদেশ দিতেন। তাদের কথামতো আমরা সালাত পড়তে যেতাম। সালাত আমাদের অনেক ভারী মনে হতো। তাই আমরা সালাত ছেড়ে দিতাম!

বড় হওয়ার পর কখনো শাইখদের মুখে সালাতের গুরুত্ব ও সালাত পরিত্যাগের শাস্তি নিয়ে আলোচনা শুনি। তখন আবার সালাত পড়তে যাই। সালাত আমাদের অনেক ভারী মনে হয়। তাই আমরা আবার সালাত ছেড়ে দিই।

আমরা মনে করতাম, সালাত নিয়ে বড়দের যে অনুভূতি, সেটি আমাদের নেই। বড়রা সালাতে নিয়মিত থাকতে পারছে, কারণ তারা আমাদের বড়। যখন আমরা বড় হব, তখন আমাদের মাঝেও একই রকম অনুভূতি তৈরি হবে, আমরাও সালাতে নিয়মিত হব।

কিন্তু আমরা যখন বড় হলাম, তখনও সালাত আমাদের জন্য কঠিনই থেকে গেল। তখন আমরা ধরে নিলাম যে, যারা সালাত আদায়ে নিয়মিত, তাদের কাছে আল্লাহপ্রদত্ত এমন বিশেষ গুণ বা শক্তি কিংবা ক্ষমতা আছে, যা আমাদের নেই। যেমন : তারা হয়তো শৈশব থেকেই সালাতের অভ্যাস করে আসছে অথবা এমন বাড়িতে তারা বড় হয়েছে, যে বাড়ির সবাই সালাতের প্রতি যত্নশীল।

মনোবিজ্ঞানের পরিভাষায় এটিকে বলে, এক্সেপশন বা আইসোল্যাশন। এটি বিশেষ ধরনের মনোভঙ্গি। এই মনোভঙ্গির সারমর্ম কথা হলো, বিশেষ কোনো কাজের ব্যাপারে আপনি এই ধারণা রাখবেন যে, কাজটি আপনার দ্বারা হবে না বা আপনি এই কাজে কখনো সফল হবেন না। এই চিন্তা থেকে আপনি নিজেকে এই কাজ থেকে দূরে সরিয়ে রাখবেন। আর যারা সফলভাবে এই কাজ করে, তাদের ব্যাপারে আপনি ভাববেন, তারা এমন কোনো বিশেষ ক্ষমতা বা প্রতিভার অধিকারী, যা আপনার মাঝে নেই।

আমাদের মাঝেও সালাত আদায়কারীদের প্রতি একটা এক্সেপশন বা আইসোল্যাশন টাইপের মনোভঙ্গি তৈরি হয়েছে। কারণ আমরা এখন উপলব্ধি করছি, সালাত আদায় করা আমাদের জন্য কঠিন; যেখানে তারা অনায়াসে সালাত আদায় করতে পারে, সেখানে আমরা এক ওয়াক্ত সালাত আদায় করতেই হিমশিম খাই। আমাদের এমন সাইকোলজিক্যাল সমস্যা তৈরি হওয়ার কারণ হচ্ছে, আমরা সমস্যাটা গোড়া থেকে সমাধান করার চেষ্টা করছি না। এখানে আসল প্রশ্নটা হচ্ছে, কেন সালাত আমাদের জন্য এতটা কঠিন?!

এ প্রশ্নের উত্তর লুকিয়ে আছে সালাত ফরজ হওয়ার সূচনার মধ্যে। যেকোনো জিনিসের সূচনা জানতে পারলে সে বিষয়টা সহজে বোঝা যায়। সালাত ফরজ হয় ইসরা ও মিরাজের রাতে। নবুওয়াত লাভের ১২ বছর পরে।

এ থেকে কী বোঝা গেল?!

বোঝা গেল, সালাত ফরজ হওয়ার আগে আল্লাহর নবি ﷺ নবুওয়াত লাভের পর ১২ বছর ধরে সাহাবিদের দ্বীনের কথা শুনিয়েছেন, কুরআন তিলাওয়াত করেছেন। আল্লাহ তাআলা মহাপ্রজ্ঞাবান, সবকিছু জানেন তিনি। ১২ বছর

পর সালাত ফরজ করার মাঝে তাঁর বিরাট প্রজ্ঞা বিদ্যমান আছে। সালাত ফরজ করার আগে আল্লাহ সম্পর্কে সাহাবিদের জানানো জরুরি ছিল। আল্লাহর গুণাবলি, তাঁর রহমত, তাঁর ক্ষমতা সম্পর্কে জানানো দরকার ছিল। এভাবে যখন সাহাবিদের অন্তরে আল্লাহর ভালোবাসা সঞ্চারিত হলো, তাঁদের ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে সালাত ফরজ হলো। ফলে অনায়াসে সালাত তাঁদের অন্তরে জায়গা করে নিল। ১২ বছরের দ্বীন শিক্ষার সময় আল্লাহর সাথে যোগাযোগ করা, তাঁর সাথে কথা বলার জন্য তাঁদের মনে প্রবল আগ্রহ জেগেছে, তাঁদের মন প্রবল উৎসুক হয়েছে। যখন সালাত ফরজ হলো, তখন সহজেই সালাত জায়গা করে নিল তাঁদের অন্তরে।

প্রথমে আদেশদাতাকে জানা হলো। ফলে তাঁর আদেশ পালনও সহজ ও অনায়াস হয়ে গেল। আল্লাহর পক্ষ থেকে সালাত ফরজ হলো। বাহ্যিকভাবে এটা ছিল একটি আদেশ, আল্লাহর ফরজকৃত অবশ্য-পালনীয় কাজ। কিন্তু অভ্যন্তরীণভাবে এটা ছিল একজন প্রিয়তমের পক্ষ থেকে প্রিয়জনের কাছে পাঠানো উপহার। যে উপহারের মাধ্যমে প্রিয়তমের সাথে তাঁর প্রিয়জনেরা সহজে যোগাযোগ করবে, একান্তে গিয়ে কথা বলবে।

এ জন্যই অনেক সাহাবি পুরো রাত সালাত আদায় করতে এতটুকুও কষ্ট অনুভব করতেন না। কারণ সালাত তো তাঁদের কাছে ছিল রবের একান্ত সান্নিধ্য। অনেক সাহাবি সালাতুত দুহা ১২ রাকআত আদায় করতেন। কিয়ামুল লাইল আদায় করতে করতে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর পা ফুলে যেত।

এখানে আশ্চর্যের কিছুই নেই। কেন? কারণ আমরা জানি, প্রিয়জনের সাথে কথা বলতে বলতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেওয়া যায় অনায়াসে। আল্লাহ রব্বুল আলামিনের জন্যই তো সর্বোচ্চ মর্যাদা! তাই সাহাবিদের জন্য সালাতের আদেশ ছিল বিরাট পাওয়া—বিশাল একটি নিয়ামত। সালাতের আদেশ সাহাবিদের জন্য কেবল আদেশ নয়; বরং এটা হচ্ছে প্রিয়তমের চাওয়া। আর প্রিয়জনের কাছে প্রিয়তমের চাওয়া পূরণের চাইতে অধিক আনন্দের কিছু নেই।

তাই সালাতে নিয়মিত হওয়া ও সালাত আদায়ের আগে আপনাকে যে দক্ষতা অর্জন করতে হবে সেটা হচ্ছে, আল্লাহ রব্বুল আলামিনকে জানা। এ বইয়ের

শেষ পরিচ্ছেদকে আমরা এ বিষয়ের জন্য বরাদ্দ করেছি। আপনার জন্য এই পরিচ্ছেদটি হতে পারে আল্লাহ তাআলাকে জানার ভূমিকা। আল্লাহকে জানলে নিজের অজান্তেই তাঁর ভালোবাসা আপনার অন্তরে জায়গা করে নেবে, যদি তাঁকে ভালোবাসেন, তাহলে তাঁর আনুগত্যে নিজেকে সঁপে দিতে পারবেন।

আল্লাহ তাআলা অসীম দয়ালু, পরম স্নেহপরায়ণ, তাওবা-কবুলকারী। আল্লাহর সাথে আপনার কেবল আদেশ-নিষেধের সম্পর্ক—আপনার এ বিশ্বাসটা ভুল। আবার আল্লাহর আদেশ-নিষেধকে উপেক্ষা করে, নবিগণ, শহিদগণ এবং নেককারগণ কেবল আল্লাহর ভালোবাসার মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিলেন, এমনটা ভাবারও কোনো সুযোগ নেই। আল্লাহর সাথে আপনার সম্পর্ক হচ্ছে যুগপৎ ভালোবাসা ও আনুগত্যের।

আল্লাহ তাআলা বান্দার অতি নিকটে। যেসব গুনাহগার নিজেদের ওপর জুলুম করেছে, তারা গুনাহগার হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা তাদের দূরে ঠেলে দেননি, তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেননি; বরং নিজের বান্দা বলে সম্বোধন করে বলেছেন :

يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

'হে আমার বান্দারা, যারা নিজেদের ওপর বাড়াবাড়ি করেছ, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। আল্লাহ সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন। তিনি অতি ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু।'[১]

এমন প্রভুকে না জেনে থাকা যায়?!

তাই আপনাকে জানতে হবে আল্লাহর প্রকৃত পরিচয়—কে তিনি, কেমন তিনি।

আল্লাহ সর্বশ্রোতা, আপনি যেখানেই থাকুন না কেন তিনি আপনার দুআ শুনেন।

---

১. সুরা আজ-জুমার, ৩৯ : ৫৩।

আল্লাহ পরম প্রতিদানদাতা, আপনার কোনো আমলই বৃথা যেতে দেবেন না তিনি, ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র পুণ্যেরও প্রতিদান পাবেন তাঁর কাছ থেকে।

আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, আপনার ভয় ও আশঙ্কার সময় তাঁর কাছেই পাবেন আশ্রয়, তিনিই হবেন আপনার ভরসা।

আল্লাহ শান্তিবিধায়ক, তাঁর সকল কাজ কল্যাণময়।

শান্তিবিধায়ক আল্লাহকে জানার পর তাঁর প্রতি সুধারণায় ভরে যাবে আপনার অন্তর, আপনার অন্তর ভরে যাবে অপার্থিব প্রশান্তিতে।

আপনি যদি তাঁর কাছে কোনো অভাব নিয়ে আসেন, তিনি আপনাকে সমৃদ্ধি দান করবেন।

আপনি যদি তাঁর কাছে কোনো কষ্ট নিয়ে আসেন, তাঁকে পরম দয়াময় হিসেবে পাবেন।

মানুষের কঠোরতা ও রূঢ়তায় অতিষ্ঠ হয়ে যদি তাঁর কাছে আসেন, আপনি তাঁকে পরম সহানুভূতিশীল পাবেন।

যে আপনার ওপর জুলুম করেছে, আল্লাহ তার জন্য পরাক্রমশালী। যে আপনাকে অপমানিত করেছে, আল্লাহ তাকে লাঞ্ছিতকারী।

প্রতিদিন কারও কাছে আল্লাহ সম্পর্কে শুনুন। কাজটা কঠিন নয়, জটিলও নয়। প্রতিদিন ১৫ থেকে ৩০ মিনিট মাত্র। এ সামান্য প্রয়াস আপনার অন্তরকে আল্লাহর ভালোবাসায় পূর্ণ করে দেবে। আপনার পছন্দের কোনো শাইখের কথা শুনুন। যে শাইখের বলার ধরন ভালো লাগে, যে শাইখের কথা আপনার অন্তর পর্যন্ত পৌঁছায়, সে শাইখের আলোচনা শুনুন। অথবা সে কারির তিলাওয়াত শুনুন, যার কণ্ঠে তিলাওয়াত শুনলে মনে হয় আপনার অন্তরে কুরআন জায়গা করে নিচ্ছে। বাড়ি ও অফিসে আসা-যাওয়ার সময়টা কাজে লাগান। গাড়িতে বসে কোথাও যাওয়ার সময়টা কাজে লাগান। অথবা কোথাও বসে কারও জন্য অপেক্ষা করার সময়টা কাজে লাগান। ঘুমোনোর আগের অলস সময়টা কাজে লাগান।

ওয়াজের ছোট ছোট অডিও-ভিডিও ক্লিপ শুনুন। কিংবা নবিদের গল্প, সাহাবি-তাবিয়িদের কাহিনি শুনুন। আরও শুনতে পারেন নেককারদের বাস্তব জীবনের উপাখ্যান। এ কাজগুলোকে দৈনন্দিন জীবনের অংশ করে নিন। দেখবেন, আপনার জীবন পরিবর্তিত হয়ে যাবে অচিরেই। আপনার ইলম বৃদ্ধি পাবে। অন্তর নরম হবে। আপনার প্রতি আল্লাহর ভালোবাসা বুঝতে পারবেন। এভাবে আল্লাহর প্রতি আপনার ভালোবাসা বেড়ে যাবে। আর এ ভালোবাসার সম্পর্কই আপনাকে জায়নামাজে এনে দাঁড় করাবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ

'আর আপনি উপদেশ দিতে থাকুন, কেননা উপদেশ মুমিনদের উপকারে আসবে।'[২]

উপদেশ মুমিনের উপকারে আসে, তাই কোনো কিছু গোপন রাখব না আমি। আপনি সালাত আদায় করছেন না, কারণ আপনি আসলে আল্লাহ তাআলাকে ততটা চেনেন না, যতটা চেনার দাবি করে থাকেন।

তাই শত শত দায়িদের মধ্য থেকে এখানে কয়েকজন দায়ির নাম উল্লেখ করছি। যার দিকে আপনার মন সায় দেবে, তাকে বেছে নিন। তার কথা শুনুন, তার লেখা পড়ুন, ইসলামকে জানুন, আল্লাহকে জানুন।

১. শাইখ মুহাম্মাদ রাতিব নাবলুসি।

২. ড. আব্দুল মুহসিন আহমাদ।

৩. শাইখ হাবিব আলি জাফরি।

৪. শাইখ মুহাম্মাদ মুতাওয়াল্লি শারাবি।

৫. শাইখ উমর আব্দুল কাফি।

৬. ড. আলি আবুল হাসান।

২. সুরা আজ-জারিয়াত, ৫১ : ৫৫।

৭. ড. মুহাম্মাদ সাউদ রাশিদি।

৮. শাইখ মাবরুক জাদুল খাইর।

৯. ড. মুস্তফা মাহমুদ।

১০. দায়ি মুস্তফা হুসনি।

১১. শাইখ নাবিল আওদি।

১২. শাইখ খালিদ আর-রাশিদ।

১৩. দায়ি মিশারি খাররাজ।

১৪. শাইখ মুহাম্মাদ মুখতার শানকিতি।

আরও আছেন কারি ফাহাদ কানদারি। 'ইহতাদাইতু বিল কুরআন' নামের একটা প্রোগ্রামে তিনি সদ্য ইসলাম গ্রহণকারীদের গল্প তুলে ধরেন। এসব গল্প আপনার মাঝে ইমানের নিয়ামত বৃদ্ধি করবে এবং আপনার অন্তরে ইমানকে আরও সুদৃঢ় করবে। আপনি দেখতে পাবেন, যেসব মানুষ দুনিয়ার অঢেল সম্পত্তির মালিক হয়ে ছিলেন, দুনিয়ার অঢেল সম্পদের ভোগবিলাস তাদের সুখ দিতে পারেনি, তাদের আত্মার খোরাক দিতে পারেনি; এরপর যখন তারা আল্লাহকে চিনলেন, ইসলাম গ্রহণ করলেন, তখন যেন তারা দুনিয়ার সব সুখ পেয়ে গেলেন।

কয়েকজন কারি :

১. কারি আহমাদ নাফিস।

২. কারি উমর শিবলি।

৩. কারি ওয়াদি ইয়ামানি।

৪. কারি মিশারি আফাসি।

৫. কারি মুহাম্মাদ সিদ্দিক মিনশাবি।

৬. শাইখ আব্দুর রশিদ সুফি।

৭. কারি নাসির কাতামি।

৮. কারি হাতিম ফরিদ।

৯. কারি ইদরিস আবকার।

আহমাদ দিদাত ও তার ছাত্র জাকির নায়িকের বিতর্ক শুনা যায়। বিভিন্ন ধর্মের তুলনামূলক আলোচনায় তারা বিশেষ পারঙ্গম।

দ্বীনি কবিতা আবৃত্তি শুনতে পারেন। আপনার পছন্দ হওয়ার মতো কিছু নাশিদ : সামির দুররা কৃত اطع امرنا। মিশারি রাশিদ কৃত أغيبل ও ليس الغريب। এ ছাড়া মুস্তফা আতিফের নাশিদও শুনতে পারেন।

যদি পড়তে ভালোবাসেন, তাহলে চমৎকার উপদেশপূর্ণ ছোট কিতাব দিয়ে শুরু করতে পারেন। 'আনিসুল মুমিনিন'[৩] নামে একটা বই আছে। সাহাবি, তাবিয়ি ও সালিহিনের বিভিন্ন প্রকার চমৎকার গল্প দিয়ে পরিপূর্ণ এ বইটি।

তা ছাড়া প্রতিদিন পাঁচ মিনিট বরাদ্দ করুন আল্লাহর জিকিরের জন্য। অন্য সব কাজ বাদ দিয়ে এক মনে এক ধ্যানে আল্লাহর জিকিরে মনোনিবেশ করবেন পাঁচ মিনিটের জন্য। তাড়াহুড়ো করবেন না। শান্ত, ধীরস্থিরভাবে, মনোযোগের সাথে জিকিরের প্রতিটি বাক্য উচ্চারণ করুন। কারণ 'কে বেশি আমল করে' এ বিষয়টার চেয়ে 'কে বেশি সুন্দর আমল করে' এটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও অগ্রগণ্য।

আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমল হচ্ছে, যে আমল পরিমাণে কম হলেও নিয়মিত করা হয়।

তাই যখনই ওই ছোট ছোট আমল করার সুযোগ পাবেন, তখনই করে ফেলুন। এসব আমল করতে বেশি সময় ও বেশি পরিশ্রমের দরকার হয় না। এসব আমল আপনার আত্মাকে শক্তিশালী করবে, আপনাকে শয়তানের ওয়াসওয়াসার বিরুদ্ধে সাহায্য করবে। খাবার যেরকম শরীরের জন্য খোরাক, তেমনই আল্লাহর জিকির আত্মার খোরাক। আল্লাহর জিকির করে আপনি সহজেই এ কল্যাণের অধিকারী হতে পারেন।

---

৩. বইটিতে প্রচুর জাল বর্ণনা আছে। তাই সতর্কতা কাম্য। - অনুবাদক।

কুরআন বলছে :

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ

‘আর আপনি উপদেশ দিতে থাকুন, কেননা উপদেশ মুমিনদের উপকারে আসবে।’[৪]

আল্লাহর জিকিরের রিমাইন্ডার হিসেবে এ আয়াতটি স্টিকারের মতো করে আপনার রুমে, গাড়িতে কিংবা অফিসে লাগিয়ে রাখতে পারেন। আপনার মোবাইল বা ব্যক্তিগত কম্পিউটারের ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন। ফলে আল্লাহর জিকিরসমৃদ্ধ কোনো অডিও-ভিডিও শুনতে অথবা কোনো বই পড়তে এটাই আপনাকে উৎসাহিত করবে। এভাবে সময়ের পালাবদলে আপনি নিজের জীবনে পরিবর্তন লক্ষ করবেন। যারা সালাত আদায়ের পাবন্দ এবং যাদের অন্তর মসজিদের সাথে লেগে থাকে, তাদের সফলতার পেছনের রহস্যগুলোর মধ্যে এটা অন্যতম।

৪. সুরা আজ-জারিয়াত, ৫১ : ৫৫।

মানুষ তার চিন্তার সমষ্টি

আপনি চাই মানুন বা না মানুন; আপনার মনের ভেতর যে কথোপকথন চলে, সেটাই আপনার জীবন পরিচালনা করে।[৫] আপনি আপনার চিন্তাগুলোর সমষ্টি মাত্র। প্রতিদিন আপনি যা করেন, সেসব কাজ আপনার চিন্তার ফসল। আর এ চিন্তাভাবনাই আপনার মস্তিষ্ককে দখল করে আছে, নিয়ন্ত্রণ করছে। যদি আপনি জীবনের কোনো ক্ষেত্রে ভালো কিছু করতে চান, তাহলে আপনার চিন্তাভাবনাকে সেদিকে প্রবাহিত করতে হবে, ভালো চিন্তাভাবনা করতে হবে। সাইকোলজিতে একটা কথা আছে :

আপনি যদি বিশ্বাস করেন যে, আপনি একটা কাজে সফল হবেন, তাহলে আপনি তাতে সফল হবেন। আবার আপনি যদি বিশ্বাস করেন যে, আপনি সে কাজটাতে সফল হবেন না, তাহলে আপনি সফল হবেন না। উভয় অবস্থাতেই আপনি সঠিক।

তাই আপনাকে কোনো কিছুতে সফল হতে হলে প্রথমে বিশ্বাস করতে হবে যে, আপনি কাজটাতে সফল হতে সক্ষম।

বিখ্যাত বক্সার মুহাম্মাদ আলি ক্লে যখন এ প্রশ্নের সম্মুখীন হলেন যে, 'আপনার সফলতার রহস্য কী?' তিনি বললেন, 'আমি সব সময় একটা কথা উচ্চারণ

---

৫. দুই বা ততোধিক মানুষের সাথে কথোপকথনকে বলা হয় Dialogue (সংলাপ)। অন্যদিকে একা একজনের কথা বলাকে বলা হয় Monologue। শব্দটি গ্রিক শব্দ Monologos থেকে এসেছে, যার অর্থ হচ্ছে একাকী কথা বলা। - অনুবাদক।

করি। কথাটা হচ্ছে 'আমিই সেরা।' অবশ্য ইসলাম গ্রহণের পরে মহান আল্লাহর প্রতি নিজেকে সমর্পণ করার পর তিনি কথাটা পরিবর্তন করে ফেলেন।

নিজের মনোবলকে শক্ত করে তিনি ইতিহাসের সবচেয়ে সেরা বক্সার হয়েছেন। তার বারবার উচ্চারণ করা কথাটা ডেইলি ওয়ার্ক আউটে নিয়মিত থাকতে তাকে সহায়তা করত। এ পদ্ধতিটা তিনি প্রতিটি লড়াইয়ের কঠিন মুহূর্তগুলোতে ব্যবহার করতেন। যদি এ ইতিবাচক চিন্তাভাবনা ক্লের মনকে নিয়ন্ত্রণ না করত, তাহলে সে কখনো সফলতা অর্জন করতে পারত না।

নিজের মাথার ভেতরের চিন্তাভাবনাকে ছোট করে দেখবেন না, তুচ্ছ করে দেখবেন না। কারণ মানুষের প্রতিটি সৎকর্ম তার চিন্তার ফসল। তেমনই মানুষের কৃত প্রতিটি গুনাহ ও অপরাধের শুরু হয় চিন্তাভাবনার মাধ্যমে। ইবলিসের একমাত্র অস্ত্র হচ্ছে তার ওয়াসওয়াসা তথা কুমন্ত্রণা। ইবলিসের কুমন্ত্রণা মানুষের চিন্তার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। তাই আপনার করণীয় হচ্ছে নিজের মস্তিষ্ককে নেতিবাচক ও ধ্বংসাত্মক চিন্তাভাবনা থেকে রক্ষা করা। এবং তার স্থলে সর্বদা ইতিবাচক ও সৃষ্টিশীল চিন্তাভাবনাকে স্থলাভিষিক্ত করা।

আপনার মস্তিষ্ক মাটির মতো। মাটিতে যেকোনো ধরনের ফসল বুনা যায়। আপনি যে ফসলের বীজ বপন করবেন, সে ফসলই সেখানে জন্মাবে। আপনার মস্তিষ্কে ভালো-মন্দ, ভুল-শুদ্ধ, সৃষ্টিশীল-ধ্বংসাত্মক যে চিন্তাই রোপণ করবেন, বিনা বাক্য ব্যয়ে, বিনা প্রশ্নে আপনার মস্তিষ্ক সেটা গ্রহণ করবে। সময়ের পরিক্রমায় এসব চিন্তাই আপনার অভ্যাস ও স্বভাব গঠন করবে।

স্মরণ করে দেখুন, যখন আপনি কারও নেতিবাচক মন্তব্য শুনেছেন, তখন তার কথার কারণে আপনার মনের ওপর নিরাশা, সংকীর্ণতা কিংবা দুশ্চিন্তার ছাপ পড়েছিল। স্মরণ করে দেখুন, যখন আপনি কারও কাছে ইতিবাচক মন্তব্য শুনেছেন, তখন তার কথার কারণে আপনার মনের ভেতর সুখ ও প্রফুল্লতা অনুভব করেছেন।

এ মন্তব্যকারী আপনার বন্ধু হতে পারে, হতে পারে আপনার পরিবারের কেউ, অথবা হতে পারে এমন কেউ, যাকে আপনি চেনেন না। কিন্তু তার ইতিবাচক-নেতিবাচক কথার প্রভাব আপনার চিন্তাকে প্রভাবিত করে আপনাকে কখনো হতাশ করেছে, কখনো উৎসাহী করেছে।

যেকোনো মানুষ তার কথার মাধ্যমে আপনার অনুভূতিকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করতে পারে। এ জন্য আমাদের নবি ﷺ বলেছেন : وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ - 'উত্তম কথা বলা সদাকা।'[৬] কারণ শ্রোতার ওপর উত্তম কথার উত্তম প্রভাব পড়ে।

একইভাবে চিন্তার জগতে আপনার নফস আপনাকে যে কথা বলে সেটারও প্রভাব পড়ে সমানভাবে। বাহ্যিকভাবে যদিও আপনি নীরব থাকেন। আপনার নফসের কথায় আপনি সুখী বা চিন্তিত হতে পারেন, আশান্বিত হতে পারেন বা হতাশ হতে পারেন, সন্তোষ বা অসন্তোষে ভুগতে পারেন। তাই উত্তম হচ্ছে নিজেকে উত্তম কথা বলে নিজেই নিজের ওপর সদাকা করা।

সালাত সম্পর্কে আপনার নফস আপনাকে যা বলবে, আপনার মস্তিষ্ক যেভাবে এগোবে—তার ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভর করবে যে, আপনি সালাত-আদায়কারী হবেন না সালাত-ত্যাগকারী হবেন।

হয়তো সালাত নিয়ে আপনার কোনো নেতিবাচক স্মৃতি আছে। এ স্মৃতিটা আপনার মস্তিষ্কে সালাত নিয়ে এমন একটা চিত্র তৈরি করে, যেখানে দেখা যায় সালাত একটি কঠিন কাজ অথবা ক্লান্তিকর কাজ। মস্তিষ্ক তখন সিগনাল দেয় যে, এ কাজ থেকে দূরে থাকা বা এ কাজ ত্যাগ করাই তোমার কর্তব্য। তখন আপনার নফস আপনাকে বলে, 'তুমি সালাতে নিয়মিত হতে পারবে না, সালাতের পাবন্দ হতে পারবে না, তুমি সালাতের অভ্যেস করোনি, কখনো সালাতে খুশু-খুজু রাখতে পারবে না।' অথবা এটা বলে যে, 'যারা নিয়মিত সালাত আদায় করে, তাদের আসলে বিশেষ শক্তি-সামর্থ্য আছে, যা তোমার নেই। তাদের জীবন বিশেষ সুযোগ-সুবিধায় পূর্ণ, যা তোমার আদৌ নেই।'

এ চিত্রটা মোটেই সঠিক নয়। সালাতের সারমর্ম মোটেই এমন নয়। এখানে করণীয় হচ্ছে আল্লাহ তাআলাকে চেনা, তাঁকে জানা। এ জানা ও চেনার মাধ্যমে ধীরে ধীরে আপনার মস্তিষ্কে বসে থাকা এ ভুল ও নেতিবাচক চিত্রটা সরে যাবে, সেখানে স্থান করে নেবে সালাতের প্রকৃত রূপটা।

---

৬. সহিহুল বুখারি : ২৯৮৯।

কষ্ট ও সুখ

মনোবিজ্ঞানীদের মতে, দৈনন্দিন জীবনে কষ্ট ও পরিশ্রম করতে হলেও আমরা বিভিন্ন কষ্টসাধ্য কাজ করি। আমরা তা করি, কারণ না করলে যে কষ্ট ও দুর্ভোগ পোহাতে হবে, তা থেকে বাঁচতে চাই আমরা, অথবা এ জন্য করি যে, তা করার কারণে আমরা কোনো উপকার পাই। তাই কষ্ট ও সুখই মানুষকে কোনো কাজে নিযুক্ত করে।

যেমন অনেক মানুষই প্রতিদিন সকালে মন থেকে কাজে যেতে চায় না। কিন্তু তাদের না চাওয়া সত্ত্বেও তারা কাজে এসে উপস্থিত হয়। কারণ কাজে না গেলে যে কষ্ট ও দুর্ভোগ তাদের পোহাতে হবে, সেটা থেকে তারা বাঁচতে চায়। কাজে না আসলে তো তার চাকুরিচ্যুতি ঘটবে অথবা মাস শেষে তার যেসব বিল আসবে, সেসব পরিশোধ করতে পারবে না সে। তাই কষ্ট কাটাতে মানুষ না চাওয়া সত্ত্বেও পরিশ্রমের কাজ করে।

অন্যদিকে কিছু মানুষকে সব সময় সকালবেলা ঘুম থেকে উঠতে দেখা যায়। নিয়মিত সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে যাওয়া তার অভ্যাস। এমনকি ছুটির দিনগুলোতেও। অন্যদিকে অনেকে সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠতে চাইলেও পারে না, কিন্তু এরা কীভাবে পারে? তারা প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠতে পারে, কারণ তারা সকালে ঘুম থেকে ওঠার উপকারিতা বুঝতে পেরেছে, সকালে ওঠার মধ্যে সুখের অনুভূতি পেয়েছে।

আশ্চর্য কথা হচ্ছে, আমাদের চিন্তাভাবনাই কষ্টকর কাজ বা সুখকর কাজ করার প্রতি আমাদের মানসিকতা গঠন করে দেয়। আপনি এমন কোনো কাজের কথা মনে করে দেখুন, আপনাকে একটা অপছন্দনীয় কাজ করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। মনে করে দেখুন, কীভাবে আপনার চিন্তাভাবনা আপনার জন্য কাজটা কঠিন করে দিয়েছিল। কিন্তু যখনই কাজটা করা শুরু করলেন এবং তাতে ডুবে গেলেন, তখন আপনি ভুলেই গেলেন যে, একটু আগেও এ কাজটা করা আপনার কাছে কঠিন মনে হয়েছিল। আপনার নফস আপনাকে কঠিন বলেছিল আসলে কাজটা কঠিন ছিল না মোটেই।

অবশ্যই এখানে শয়তানের ভূমিকার কথা আসে। সেটা হচ্ছে ওয়াসওয়াসা বা কুমন্ত্রণা। শয়তান আপনার সামনে সালাতকে এমন একটা কাজ হিসেবে তুলে ধরবে যে, কাজটা অনেক কঠিন, কষ্টকর। শয়তান বারবার এ কথাটা আপনার মনে ঢুকিয়ে দিতে থাকবে। একসময় আপনার মস্তিষ্কে এটা শক্ত হয়ে গেড়ে বসে যাবে যে, আসলেই সালাত আদায় করা কঠিন।

চার মিনিটে এক মাইল

চার মিনিটে এক মাইল পাড়ি দেওয়ার গল্পটাকে আপনি বিশেষ গল্প হিসেবে ধরতে পারেন। কারণ যেসব গল্প মানুষের প্রত্যয় নিয়ে কথা বলে, তার মধ্যে এটা অন্যতম। এ গল্পে আমরা দেখি যে, মানবজাতি যেটাকে অসম্ভব মনে করত, একজন মানুষ নিজের প্রত্যয় ঠিক করে, নিজের মানসিকতায় পরিবর্তন এনে সে অসম্ভব কাজকে সম্ভব করেছে।

হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ এটা বিশ্বাস করে এসেছে যে, একজন মানুষের পক্ষে চার মিনিটের মতো কম সময়ে এক মাইল পথ অতিক্রম করা অসম্ভব। কিন্তু রজার ব্যানিস্টার ১৯৫৪ সালে চার মিনিটেরও কম সময়ে এক মাইল পথ অতিক্রম করে মানুষের ভুল ভেঙে দিলেন।

রজার বলেন, 'এ সফলতার পেছনে কেবল কঠোর ব্যায়াম ও অনুশীলনই ছিল না। বরং শরীর গঠনের সাথে সাথে মানসিকতা গঠন করাও জরুরি ছিল।' তিনি সর্বদা নিজেকে বুঝাতেন যে, তিনি এ রকম রেকর্ড করতে পারবেন। নিজেকে বোঝাতে থাকলেন যে, এটা সম্ভব। চিন্তার গঠন করতে করতে এক সময় এটা তার অপ্রতিরোধ্য প্রত্যয়ে রূপ নেয়। এভাবে তিনি সফল হন।

তা ছাড়া এক বছরের মাথায় রজারের মতো আরও ৩৭ জন ক্রীড়াবিদ এ রেকর্ডটাও ভেঙে ফেলে। রজারের অভিজ্ঞতা তাদের জন্য রেফারেন্স পয়েন্ট হিসেবে কাজ করে আর তাদের মানসিকতা পরিবর্তন করে তাদের প্রত্যয় ঠিক করে দেয়। ফলে যেটাকে তারা অসম্ভব মনে করত, সেটা সম্ভব হয়ে সফলতা তাদের হাতে ধরা দেয়।

এসব ওয়ার্ল্ড রেকর্ড তারা অলৌকিক বায়োলজিক্যাল শক্তিতে অর্জন করেনি। বরং তারা নিজেদের চিন্তাভাবনায় পরিবর্তন এনে, তাদের মানসিকতাকে শক্তিশালী করে অর্জন করেছিল তাদের সফলতা।

সালাতের স্বরূপ

সালাতের প্রতি আপনার মনোভাবে পরিবর্তন আনুন। সালাতের সাথে আপনার সুন্দর স্মৃতিগুলোর মধ্যে একটা সুন্দরতর স্মৃতিকে কাজে লাগান। সে সুন্দর স্মৃতিকে আপনার মস্তিষ্কে সালাতের স্বরূপ প্রতিফলিত করতে দিন। সে দিনটার কথা চিন্তা করুন, যেদিন আপনি সুস্থিরভাবে, বিনম্র চিত্তে সালাত আদায় করেছিলেন। চিন্তা করুন, খুশু-খুজুপূর্ণ সে সালাতের পরে আপনার অন্তর কেমন সুখানুভূতিতে ভরে গিয়েছিল। মনে করে দেখুন, রামাজানের তারাবিহর সালাত আদায় করার সময় কেমন প্রফুল্ল হয়ে উঠেছিল আপনার মন। অথবা আপনার দেখা সবচেয়ে সুন্দর করে সালাত আদায়কারীর কথা স্মরণ করুন। তার কথা স্মরণ করুন, যার মতো সুন্দর করে সালাত আদায় করতে চান আপনি। কত সুন্দর করে, ধীরস্থিরভাবে, খুশু-খুজুর সাথে সালাত আদায় করছিলেন তিনি, সেটা ভাবুন।

সালাতের এমন সুন্দর চিত্র মনের ভেতর প্রতিফলিত করতে আপনার মস্তিষ্কের সাথে লড়াই করুন। 'সালাত কঠিন, সালাত পড়ে নিজেকে কষ্টে ফেলতে হবে না'—যখনই শয়তান আপনার মনের ভেতর এমন কিছু ঢুকানোর চেষ্টা করবে, তখন আপনি আপনার মাথা থেকে এসব চিন্তা ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করুন। আর তার স্থলে এরচেয়ে বেশি পরিমাণে ইতিবাচক চিন্তা স্থলাভিষিক্ত করুন। নেতিবাচক চিন্তাকে বদলে দিন ইতিবাচক চিন্তা দিয়ে। আর আপনি একই সময়ে দুটা জিনিস নিয়ে চিন্তা করতে পারবেন না, তাই নেতিবাচক চিন্তা বিদায় করলে ইতিবাচক চিন্তাভাবনার ফলে আপনি সফল হবেন।

আপনি যদি নিজের নফসের সাথে লড়াই করে আপনার মস্তিষ্কে সালাতের চিত্র এভাবে প্রতিফলিত করতে পারেন যে, সালাত হচ্ছে শান্তি, সমৃদ্ধি, সৌভাগ্যের মাধ্যম, তাহলে যদিও আপনি সালাতে নিয়মিত না হতে পারেন, তবুও ভবিষ্যতে আপনার অবচেতন মন আপনাকে ধীরে ধীরে সালাতে নিয়মিত

হওয়ার দিকে ধাবিত করবে। শয়তানের ওয়াসওয়াসা আপনার ওপর বেশি প্রভাব ফেলতে পারবে না।

এ বিষয়টা আমরা নবি ﷺ থেকে শিখেছি। সালাতের সময় হলে তিনি বিলাল ﵁-কে বলতেন : (يَا بِلَالُ أَقِمِ الصَّلَاةَ أَرِحْنَا بِهَا) 'ইকামত দাও; সালাতের মাধ্যমে আমাদের প্রশান্ত করো, হে বিলাল!'[৭]

এ কথাটা বলে নবিজি ﷺ চাইছিলেন যেন আমাদের মস্তিষ্কে সালাতের চিত্রটা শান্তি ও সুখের সাথে জুড়ে দেওয়া যায়। আর এটা সালাত আদায়ে আমাদের অনেক বড় সহায়ক ও অনেক গুরুত্বপূর্ণ উদ্দীপক।

কিছু কথা কিছু শিক্ষা

আমি সব সময় নিজেকে إِلَّا الْمُصَلِّينَ (তবে সালাত আদায়কারীগণ ব্যতীত) আয়াতটা স্মরণ করিয়ে দিই। এ আয়াতটি সুরা মাআরিজে এসেছে—

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا - إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا - وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا - إِلَّا الْمُصَلِّينَ -الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ

'মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে খুবই অস্থিরমনা করে, বিপদ তাকে স্পর্শ করলে সে উদ্বিগ্ন হয়ে যায়, আর যখন কল্যাণ তাকে স্পর্শ করে, তখন সে হয়ে পড়ে অতি কৃপণ। তবে সালাত আদায়কারীগণ ব্যতীত, যারা তাদের সালাতে সদা নিষ্ঠাবান।'[৮]

তাই যখনই আমি উদ্বিগ্নতার কিছু অনুভব করি, আমি নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিই : إِلَّا الْمُصَلِّينَ (তবে সালাত আদায়কারীগণ ব্যতীত)। আমি যতক্ষণ নিয়মিত সালাতের ওপর থাকি, ততক্ষণ উদ্বিগ্নতা আমার কোনো ক্ষতি করতে পারে না।

৭. সুনানু আবি দাউদ : ৪৯৮৫; হাদিসের মান : সহিহ।

৮. সুরা আল-মাআরিজ, ৭০ : ১৯-২৩।

যখন আমি মনের ভেতর সংকীর্ণতা অনুভব করি, তখন বলে উঠি : إِلَّا الْمُصَلِّينَ (তবে সালাত আদায়কারীগণ ব্যতীত)। আমি তখন প্রশান্তি অনুভব করি যে, আল্লাহ তাআলা আমার মনের সংকীর্ণতা দূর করে মনকে প্রশস্ত করে দেবেন।

যখন ক্লান্ত হই, তখন বলি : إِلَّا الْمُصَلِّينَ (তবে সালাত আদায়কারীগণ ব্যতীত)। কারণ সালাত শক্তির উৎস।

যখনই আল্লাহ আমাকে কোনো নিয়ামত দেন, আমি বলি : إِلَّا الْمُصَلِّينَ (তবে সালাত আদায়কারীগণ ব্যতীত)। আমার স্মরণে এসে যায় যে, সকল কিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে, তিনিই আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন।

এভাবে আমার মস্তিষ্কে সালাতের অর্থের সাথে আস্থা, প্রশান্তি ও ভারসাম্য জুড়ে যায়। সালাতের কথা আসলেই এ অনুভূতিগুলো জেগে উঠে আমার মনকে প্রফুল্ল করে তোলে।

আপনার কাছে একটা কথা লুকাব না। সময়ের সাথে সাথে যতই আমি إِلَّا الْمُصَلِّينَ (তবে সালাত আদায়কারীগণ ব্যতীত) আয়াতটা বারবার পুনরাবৃত্তি করতে থাকলাম, আমি ততই ফল পেতে শুরু করলাম। আমি যা রোপণ করলাম, তার ফসল পেলাম। আমার মস্তিষ্কে এ চিন্তাটি রোপিত করার জন্য নফসের সাথে বেশ লড়াই করার পর, বেশ কষ্ট করার পর একসময় আমার মস্তিষ্ক নিজ থেকেই কাজটা করতে লাগল।

হ্যাঁ। আবার যখনই আমার নফস ক্লান্তি বা অলসতার জন্য আমাকে সালাত আদায়ে দেরি করতে বলত, আমি তখনই তাকে স্মরণ করিয়ে দিতাম : إِلَّا الْمُصَلِّينَ (তবে সালাত আদায়কারীগণ ব্যতীত)। আমি আমার নফসের ওপর বিজয়ী হওয়া পর্যন্ত এ কথাটা বারবার বলতাম। এমনকি যদিও আমি সালাতের সময় ক্লান্ত থাকি কিংবা অলসতা আমার ওপর জেঁকে বসে, তবুও আমি নিশ্চিত বিশ্বাস করি, যদি সালাত ছুটে যায়, তাহলে আমার অবস্থা আরও শোচনীয় হবে। আমি যদি নফসকে দমিয়ে সালাতে রত হই, তবেই আমার অবস্থা ভালো হবে, ক্লান্তি-শ্রান্তি দূর হয়ে যাবে, অন্যথা নয়। এভাবে 'সালাতেই আরাম' চিন্তাভাবনাটা আমার মস্তিষ্কে প্রোথিত হয়।

আমার বিশ্বাস, জীবনে অন্তত একবার হলেও আপনি এ অবস্থায় পড়েছেন। সালাত আদায় করবেন কি করবেন না—নফসের সাথে এমন যুদ্ধে আপনাকে কখনো না কখনো নামতে হয়েছে। যখন আপনি সালাত আদায় না করার সিদ্ধান্ত নিলেন, তখন আপনি নিজেকে আরও বেশি শোচনীয় অবস্থায় ফেলে দিলেন। যদি আপনি ক্লান্তি-শ্রান্তি সত্ত্বেও সালাত আদায়ের সিদ্ধান্ত নিতেন, তাহলে সালাত আদায়ের পরে আপনার অন্তর প্রশান্তি অনুভব করত, সব ক্লান্তি-শ্রান্তি দূর হয়ে যেত এবং আপনি শরীরের উদ্যম ফিরে পেতেন।

তাই এমন একটা কথা ঠিক করে নিন, যে কথাটা আপনাকে শক্তিশালী করবে। এটাকে শয়তানের ওয়াসওয়াসার বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করুন। নিজের নফসের সাথে কথা বলার সময় এটাকে যথাযথভাবে প্রয়োগ করুন।

আপনি একটি যুদ্ধের মাঝে রয়েছেন। আপনার দুনিয়া ও আখিরাতের সৌভাগ্য অর্জন নির্ভর করছে এ যুদ্ধের সফলতার ওপর। তাই অবশ্যই আপনাকে আপনার শয়তান ও আপনার নিজের নফসের বিরুদ্ধে লড়তে হবে। যে দিক থেকে আঘাত আসে, মোক্ষম অস্ত্রের মাধ্যমে সে আঘাতকে প্রতিহত করতে হবে। আপনার মাথায় জমে থাকা অবাস্তব চিন্তাধারার কারণে আপনার অনেক সালাত ছুটে গেছে। ইবলিস এসব অবাস্তব চিন্তাভাবনা বসিয়ে দিয়েছিল আপনার মাথায়। এসব অবাস্তব চিন্তাভাবনাকে বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়ে সে আপনাকে সালাত থেকে দূরে নিয়ে গেছে। এসব ঠুনকো আর অবাস্তব কথাবার্তা স্মরণ করিয়ে দেওয়া ইবলিসের একমাত্র অস্ত্র। এর চেয়ে বেশি কিছু করার ক্ষমতা নেই তার।

এমনকি ইবলিস যখন শিকলে বাঁধা থাকে, আপনাকে কাছে পায় না, তখনও সে আপনার নফসের জন্য কাজ রেখে যায়। নফসের সাথে কথোপকথনের সময় আপনার নফস সেসব ঠুনকো চিন্তাভাবনা আপনার মধ্যে রোপণ করার চেষ্টায় রত থাকে।

অতএব, এখন থেকে সালাত নিয়ে ইতিবাচক চিন্তাধারা রোপণ করা শুরু করুন। তাহলে, নফস যখন আপনাকে সালাত নিয়ে ওয়াসওয়াসা দিতে আসবে, তখন নিজেকে নফসের সাথে কথোপকথনের সময় প্রস্তুত পাবেন।

এখানে আমি আপনাকে যে কথাটা বলেছি, সেটা সাইকোলজি বিজ্ঞানের প্রমাণিত বিষয়। এটাকে Self Talk বলে। অর্থাৎ নিজের সাথে কথা বলা। সাইকোলজিস্টগণ মনোরোগের চিকিৎসা করার ক্ষেত্রে মানুষের মনের সংকীর্ণতা, আত্মবিশ্বাস না থাকা ও হতাশা দূর করার চিকিৎসা হিসেবে Affirmations (ইতিবাচক চিন্তাভাবনা)'র পদ্ধতি অবলম্বন করেন। একই পদ্ধতি আমার সফল পাঠকগণও ব্যবহার করবেন।

আপনার মস্তিষ্ককে কাজে লাগান

সব সময় মনে রাখবেন,

আপনি যদি বিশ্বাস করেন যে, আপনি একটা কাজে সফল হবেন, তাহলে আপনি তাতে সফল হবেন। আবার আপনি যদি বিশ্বাস করেন যে, আপনি সে কাজটাতে সফল হবেন না, তাহলে আপনি সফল হবেন না। উভয় অবস্থাতেই আপনি সঠিক।

যারা নিয়মিত সালাত আদায় করতে পারে বলে আপনি বিস্ময়বোধ করেন, তারা খুবই সাধারণ একটা কাজ করে। তারা নিজেদের মস্তিষ্ককে বারবার বোঝাতে থাকে যে, তারা যেকোনো অবস্থায় সালাত আদায় করতে সক্ষম।

মানুষের মস্তিষ্ক শরীরের আর কটা অঙ্গের মতোই। শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেমন ব্যায়াম ও অনুশীলনে সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী হয়, তেমনই মস্তিষ্ককেও একটা নির্দিষ্ট চিন্তাধারায় বা নির্দিষ্ট বিশ্বাসে উন্নীত করা যায় বারবার সেটাকে অনুশীলন করে। বারবার অনুশীলনে মস্তিষ্ক এ চিন্তাভাবনাকে প্রকৃত বাস্তবতা হিসেবে মেনে নেয়।

যেমন ধরুন, আপনি যেদিন তুলনামূলক দেরিতে ঘুমোতে গেলেন, সেদিন ফজরের সালাত না পড়ার সমর্থনে হাজারো অজুহাত দেখবেন। অন্যদিকে আরেকদিন এ রকমই দেরিতে ঘুমোতে গেলেন, সেদিন আপনাকে ফ্লাইটের জন্য অথবা নতুন চাকরিতে ইন্টারভিউ দেওয়ার জন্য খুব ভোরে উঠতে হতো, সেদিন আপনি জাগার সমর্থনে শত কারণ দেখতে পাবেন এবং যথাযথ সময়ে জাগতে পারবেন।

ঘুমোনোর সময় একইরকম দেরিতে, আবার জাগার সময় একইরকম ভোরে। কিন্তু একটার ক্ষেত্রে আপনি ঘুম থেকে জাগতে পারলেন। অন্যটার ক্ষেত্রে জাগতে পারেননি। আপনার মস্তিষ্ককে দখল করে রাখা চিন্তাধারা আপনাকে একটাতে বিফল করেছে, অন্যটায় সফল করেছে। এমনটা কেন হলো?

কারণ আপনার মস্তিষ্কে রোপিত চিন্তাধারার পক্ষে আপনার মস্তিষ্ক হাজারটা যুক্তি খুঁজে বের করবে। মস্তিষ্ক এভাবে কাজ করে। এমনকি চিন্তাধারা অশুদ্ধ বা অযৌক্তিক হলেও মস্তিষ্ক সে অশুদ্ধ ও অযৌক্তিক চিন্তাধারার পক্ষেই যুক্তি খুঁজে বের করবে।

যদি আপনি আপনার মস্তিষ্ককে ঘুমোনোর আগে বলে রাখেন, আজ ক্লান্তির কারণে আপনি ফজরের সালাত আদায় করতে পারবেন না। আপনার মস্তিষ্ক এ অশুদ্ধ চিন্তার সমর্থনে সব কুযুক্তি ও অজুহাত এনে একত্রিত করবে।

আবার যদি আপনি মস্তিষ্ককে বলে রাখেন, 'কাল ফ্লাইট আছে/একটা ইন্টারভিউ আছে, কাল ভোরে ভোরে উঠতে হবে।' তখন আপনার মস্তিষ্ক আপনার চিন্তার সমর্থনে হাজারো যুক্তি একত্রিত করে আপনাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে দেবে। এমনকি এলার্ম ক্লক বাজার আগেই আপনি ঘুম থেকে জেগে উঠতে পারবেন।

যেহেতু মস্তিষ্ক এভাবে কাজ করে, তবে কেন আমরা এ পদ্ধতিটি সালাতের বিরুদ্ধে কুযুক্তি ও অজুহাত তৈরির পেছনে ব্যবহার করার পরিবর্তে সালাত আদায়ের পক্ষে যুক্তি ও উৎসাহ তৈরিতে ব্যবহার করছি না!

নফস ও আকলের সর্বদা চলমান এ যুদ্ধে নফসের বিজয়ের ফলস্বরূপ সালাত অনাদায়ের কারণে মানুষের মাঝে আত্মগ্লানির সৃষ্টি হয়। সালাত আদায় না করলে সর্বদা মনের ভেতর খালি খালি লাগে। কী যেন হারিয়ে গেছে—এমন একটা শূন্যতা তৈরি হয়। দিন শেষে সালাত আদায় না করার কারণে আপনি অপূরণীয় ক্ষতি ও প্রশান্তির শূন্যতায় ভোগেন। কারণ আপনি নিজের ফিতরাতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। আপনার ভুলের কারণে আপনার ফিতরাত পরাজিত হয়েছে।

যারা সালাত আদায় করে না, তাদের মধ্যকার অধিকাংশ লোক একদিন জামাআতের সাথে ফজর আদায় করতে পারলে অথবা একদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ঠিকভাবে আদায় করতে পারলে প্রবল প্রশান্তি ও বিরাট সৌভাগ্য অনুভব করে।

অবশেষে আমরা দেখতে পাচ্ছি, সালাত হচ্ছে সৌভাগ্য, প্রশান্তি ও স্থিরতার উৎস। অতএব, আমরা নিজেদের মস্তিষ্কে প্রশান্তিময় সালাতের কল্পচিত্র নির্মাণ করব। এটা অনুশীলন করার সময় যদিও আপনি পাঁচ ওয়াক্ত সালাত নিয়মিত পড়তে নাও পারেন, তবুও আপনার মস্তিষ্ক সালাত ত্যাগের সমর্থনে কুযুক্তি ও অজুহাত তৈরির পরিবর্তে সালাত আদায় করার সমর্থনে যুক্তি ও উৎসাহ খুঁজে আপনাকে সাহায্য করবে।

‘একদিন ভালো হয়ে যাব’র জগৎ থেকে বেরিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নিন

আপনি যেমন আশা করছেন, একদিন ভালো হয়ে যাব। হঠাৎ করে একদিন নিজেকে পুরো পাল্টে ফেলব। হঠাৎ করে নিয়মিত সালাত আদায়কারী হয়ে যাব। এ দিনটা কখনো নিজ থেকে আসবে না। তাই সে দিনটার অপেক্ষা না করে, যা করার আপনাকেই করতে হবে। ‘একদিন ভালো হয়ে যাব’র জগৎ থেকে বেরোনোর মাধ্যমেই ইবাদতময় জীবনের দিকে আপনার পথচলা শুরু করুন। কীভাবে সালাত ত্যাগ করতে হয়, সেটা শেখার পরিবর্তে কীভাবে সালাতে নিয়মিত হতে হয়, সেটা শিখুন।

সালাতে আসার আগে

প্রথমে আল্লাহ তাআলাকে চিনুন, আল্লাহ তাআলাকে জানুন। আপনি যদি তাঁকে জানেন, তবে তাঁকে ভালোবেসে ফেলবেন। আপনি তাঁকে ভালোবাসলে, তাঁর আনুগত্য হবে সহজ ও আনন্দময়।

আল্লাহ তাআলা ও আপনার সম্পর্ক কেবল আদেশ-নিষেধের সম্পর্ক নয়। আল্লাহ হচ্ছেন অসীম দয়ালু, পরম স্নেহপরায়ণ, পরম ক্ষমাশীল, পরম প্রতিদানদাতা, পরম করুণাময় ও তাওবা কবুলকারী।

আল্লাহকে স্মরণ করিয়ে দেয় এমন কারও কথা বা ওয়াজ শুনে প্রতিদিন আপনার আত্মাকে খোরাক দিন।

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ

'আর আপনি উপদেশ দিতে থাকুন, কেননা উপদেশ মুমিনদের উপকারে আসবে।'[৯]

আপনার বিশ্বাস ঠিক করুন

আপনি যদি বিশ্বাস করেন যে, আপনি একটা কাজে সফল হবেন, তাহলে আপনি তাতে সফল হবেন। আবার আপনি যদি বিশ্বাস করেন যে, আপনি সে কাজটাতে সফল হবেন না, তাহলে আপনি সফল হবেন না। উভয় অবস্থাতেই আপনি সঠিক।

আপনি আপনার নফসের সাথে কথোপকথনে মস্তিষ্ককে যেভাবে প্রস্তুত করবেন, সেভাবেই মস্তিষ্ক কাজ করবে। যদি তাকে কুচিন্তায় পূর্ণ করেন, তবে সে আপনাকে সালাত ত্যাগের জন্য হাজারটা কুযুক্তি ও অজুহাতের জোগান দেবে। অন্যদিকে যদি তাকে সুচিন্তায় অভ্যস্ত করেন, সে আপনাকে সালাত আদায়কারী হতে সাহায্য করবে, হাজারো যুক্তি ও উৎসাহ দিয়ে সহায়তা করবে। তাই সালাতের প্রতি আপনার চিন্তা সঠিক করুন, আপনি সালাত আদায় করতে পারবেন, এমনটা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতে শিখুন।

সালাতের সাথে আপনার সবচেয়ে সুন্দর স্মৃতিটাকে পুঁজি করে কাজ করুন। আপনার মস্তিষ্কে সালাতের স্বরূপ গঠন করার ক্ষেত্রে এ সুন্দর স্মৃতিটাকে ব্যবহার করুন।

সালাত পরিত্যাগে প্ররোচিত করে এমন মাধ্যমগুলোকে পরিহার করে সালাত আদায়ে সাহায্য করে এমন উপায়গুলো খুঁজতে থাকুন।

---

৯. সুরা আজ-জারিয়াত, ৫১ : ৫৫।

অলৌকিক বৈশিষ্ট্য

সাইকোলজির একটা পরিভাষা (الصفة المعجزة)। বাংলায় বললে, অলৌকিক বৈশিষ্ট্য। পৃথিবীর বুকে কৃতিত্বের ছাপ রেখে যাওয়া, জীবনের অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাফল্য পাওয়া মানুষদের জীবন নিয়ে গবেষণা করে দেখা গেছে, তাদের মাঝে একটি বৈশিষ্ট্য কমন।

এ বৈশিষ্ট্যটি মেধা নয়, প্রতিভা নয়, বিশেষ শিক্ষাও নয়, প্রাচুর্য বা ক্ষমতা এমন কোনোটাই নয়, যা তাদের জন্মের আগ থেকে প্রস্তুত ছিল আর তারা পৃথিবীতে আসতেই এসব তাদের সহায়তা করে তাদের সফল করে দিল—এমন কিছুই নয়।

বরং এদের ক্ষেত্রে উল্টোটা দেখা গেছে। তাদের অধিকাংশের মধ্যেই এ বৈশিষ্ট্যগুলো ছিল না। তাদের বেশির ভাগেরই মেধা ছিল মধ্যম স্তরের। তাদের মধ্যে এমন অনেকেই আছে, যারা প্রাতিষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষাও পূর্ণ করেনি। তাদের মধ্যে এমনও মানুষ আছে, যে জীবনের শুরুতে শরণার্থী ছিল। তাদের মধ্যে এমনও লোক আছে, যার দিনের খাবারও ঠিকমতো জুটত না।

কিন্তু এ আশ্চর্য বৈশিষ্ট্যটি তাদের সামনে সকল দরজা খুলে দিল, তাদের সামনে সবকিছু সহজ করে দিল, জীবনে বিরাট সাফল্য পেতে সহায়তা করল, এ পৃথিবীকে আবাদ করার কাজে তাদের অবদান রাখার সুযোগ এনে দিল।

আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তুর সাথে এ কথাগুলোর সম্পর্ক কী? সম্পর্ক আছে অবশ্যই। যারা বছরের পর বছর নিয়মিত সালাত আদায় করে আসছেন,

তাদের মাঝেও সে একই বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। মোটকথা, সফলদের মাঝে এ বৈশিষ্ট্যটি কমন। তাদের কাছে বিশেষ ক্ষমতা আছে বা তারা বিশেষ সুযোগ-সুবিধা পায়—এমন কিছুই নয়। কিন্তু তারা এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যটি নিজেদের মাঝে প্রয়োগ করে এটাকে অভ্যাসে পরিণত করে ফেলে। ফলে আমরা ধারণা করতে থাকি যে, নিয়মিত সালাত আদায়ের রহস্য হচ্ছে, তাদের এমন কোনো বিশেষ ক্ষমতা আছে, যা আমাদের নেই অথবা তারা আমাদের চেয়ে বেশি পরিমাণে আসমানি সাহায্য পায়, যা আমরা পাই না। না, এমনটা মোটেই নয়। তাদের সালাত আদায়ে তাদের সফলতার পেছনে এ আশ্চর্য বৈশিষ্ট্যটিই কাজ করে। এ বই পড়ে আপনি যা-ই জানুন না কেন, এ বৈশিষ্ট্যটি বোঝা ছাড়া তার সবই বৃথা।

আত্মনিয়ন্ত্রণ

Self Discipline বা আত্মনিয়ন্ত্রণ হচ্ছে সে অলৌকিক বৈশিষ্ট্য। নিয়মিত সালাত আদায়কারীদের এটি অন্যতম মৌলিক গুণ।

আপনি হয়তো মনে করেছিলেন, এসব মানুষ অথবা সালাত আদায়কারীর সফলতার রহস্য উন্মোচনে এখানে আমি কোনো ম্যাজিক ট্রিক অথবা সহজ-সংক্ষিপ্ত উপায় বাতলে দেবো। না, আপনার ধারণা ভুল। সত্য কথা হচ্ছে, আত্মনিয়ন্ত্রণ ছাড়া কোনো ধরনের সফলতাই পাওয়া যায় না। আত্মনিয়ন্ত্রণ এসব সফল লোকের অধিকাংশকে তাদের লক্ষ্য পূরণে সাহায্য করেছে। আত্মনিয়ন্ত্রণ সালাত আদায়কারীকে এমন সফলতা দিয়েছে যে, পরিস্থিতি যা-ই হোক না কেন তাদের সালাত ছুটে না কখনো। আপনিও যদি এগিয়ে আসেন, তাহলে আত্মনিয়ন্ত্রণ অচিরেই আপনাকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যক্তিতে পরিণত করবে। আপনার জীবনকে সাজিয়ে তুলবে, বিন্যস্ত করবে। আপনি সাফল্য ও সৌভাগ্য পাবেন। কারণ আত্মনিয়ন্ত্রণ মানুষের ফিতরাতের সাথে সামঞ্জস্যশীল।

আত্মনিয়ন্ত্রণ কাকে বলে? আত্মনিয়ন্ত্রণ হচ্ছে, পছন্দ-অপছন্দের তোয়াক্কা না করে নির্ধারিত সময়ে নির্দিষ্ট দায়িত্ব ও কর্তব্য আদায় করা। আত্মনিয়ন্ত্রণ হচ্ছে, সহজ ও উপভোগ্য কাজটি না করে কঠিন হলেও জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করা।

জরুরি কাজ কষ্টকর হওয়ার কারণে আপনি যদি সহজ ও উপভোগ্য কাজ করেন, তবে সে সময় তো আরাম ও আনন্দ পাবেন, কিন্তু দিন শেষে বিফলতা ও হতাশাই থাকবে আপনার অর্জনের ঝুলিতে। কারণ আপনি তো জরুরি কাজটাই ছেড়ে দিয়েছেন। অন্যদিকে জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ করার সময় আপনার কষ্ট হবে এবং ক্লান্তি ঘিরে ধরবে ঠিকই, কিন্তু দিন শেষে আপনি প্রশান্তি ও সফলতার প্রাপ্তিতে মনে প্রশান্তি পাবেন। কারণ তখন আপনার দিনটি উপকারী, ফলপ্রসূ ও মূল্যবান হবে।

আত্মনিয়ন্ত্রণ ও নিয়মানুবর্তিতার কষ্ট লজ্জা ও আফসোসের কষ্টের চেয়ে বহু গুণ কম। আমার কথাটা ভালো করে অনুধাবন করার জন্য একদিন ইশার সালাতের পর মসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে বোঝার চেষ্টা করুন অথবা যে মুসল্লি তার দিনের সব সালাত ঠিকভাবে আদায় করেছে, তাকে তার অনুভূতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করুন। অথবা যারা কোনো কঠিন লক্ষ্য সামনে রেখে অগ্রসর হয়েছে, সে লক্ষ্য সফল হওয়ার পর তাদের কাউকে তার অনুভূতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করুন।

প্রতিদিন আপনাকে শত বিকল্পের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। আপনাকে সহজ ও অগুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি এবং কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদির মাঝে যেকোনো একটাকে বেছে নিতে হয়। অবশেষে আপনি যেটাকে বেছে নেবেন, সেটাই আপনার ব্যক্তিত্ব নির্ধারণ করে দেয়।

আপনার জীবনের প্রতিটি দিনই গুরুত্বপূর্ণ। পরিস্থিতি যেমনই হোক না কেন, আপনি যতই গুরুত্বপূর্ণ কাজকে বেছে নিতে থাকবেন, ততই আপনার ব্যক্তিত্ব শক্তিশালী হতে থাকবে, আপনি নিজের কুপ্রবৃত্তির ওপর বিজয়ী হবেন; অবশেষে আত্মনিয়ন্ত্রণ ও নিয়মানুবর্তিতা আপনার অভ্যাস ও স্বভাবে পরিণত হবে।

অন্যদিকে আপনি যতই জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ কাজকে পাশ কাটিয়ে সহজ ও উপভোগ্য কাজকে বেছে নেবেন, আপনার ব্যক্তিত্ব ততই দুর্বল হতে থাকবে, আর আপনি কুপ্রবৃত্তির গোলামে পরিণত থাকবেন, গুরুত্বপূর্ণ কাজকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া আপনার স্বভাবে পরিণত হবে।

আপনাকে একটা মজার ব্যাপার বলি, আপনি এ আশা করতে পারেন যে, প্রথম প্রথম আত্মনিয়ন্ত্রণ ও নিয়মানুবর্তিতা কঠিন মনে হবে। কিন্তু আত্মনিয়ন্ত্রণ ও নিয়মানুবর্তিতার অনুশীলন করতে করতে একসময় এটা আপনার সহজাত অভ্যাসে পরিণত হবে। তখন আত্মনিয়ন্ত্রণ ও নিয়মানুবর্তিতায় আপনার কোনো কষ্ট হবে না, অনায়াসে কাজ করে যেতে পারবেন।

আপনি হয়তো এমন বাইকারকে দেখেছেন, যে বাইকার খুব দক্ষতার সাথে বাইক চালিয়ে যাচ্ছে। দেখে মনে হয়, কোনো কষ্ট বা পরিশ্রম কিংবা উন্নত দক্ষতা ছাড়াই সে বাইক চালিয়ে যাচ্ছে। যাদের বাইক চালানোর অভিজ্ঞতা নেই, তাদের অনেকে হয়তো এটাকে অত্যন্ত সহজ ও অনায়াস মনে করবে। কিন্তু তারা যেটা জানে না, সেটা হচ্ছে, এ বাইকার শুরুতে কত বার আশাহত হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু সে হাল ছাড়েনি। বেশি বেশি চেষ্টা করে গেছে। ধৈর্য ধরে কাজ করে গেছে। অবশেষে এখন সে এমন দক্ষতায় বাইক চালাতে পারছে যে, মনে হচ্ছে বাইক চালাতে তাকে কোনো কষ্ট ও পরিশ্রমই করতে হচ্ছে না।

যাদের সালাত ছুটে না, তাদের দেখে মনে হতে পারে বিনা কষ্ট ও পরিশ্রমেই তারা অনায়াসে সালাতের পাবন্দ হচ্ছে। কিন্তু যেটা আমরা দেখছি না, সেটা হচ্ছে, তারা দিনের পর দিন নিজেদের নফসের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে, নফসের দেওয়া হাজারো অজুহাতের বিরুদ্ধে লড়েছে, অবশেষে নিজেদের সঠিক পথে প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং আত্মনিয়ন্ত্রণকে নিজেদের ব্যক্তিত্বের অংশে, অভ্যাসে ও স্বভাবে পরিণত করেছে।

একইভাবে আপনিও দৈনন্দিন জীবনে আসা অজুহাতগুলোকে প্রত্যাখ্যান করে এবং নিয়মানুবর্তিতার মধ্য দিয়ে আপনার দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ আদায় করে নিজেকে আত্মনিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনতে পারেন। অজুহাত যে রকমই হোক না কেন আপনাকে তা প্রত্যাখ্যান করতে হবে। আপনার মেজাজ যেমনই হোক না কেন আপনাকে সর্বাবস্থায় কর্তব্য পালন করতে হবে। তবেই আপনি আত্মনিয়ন্ত্রণে সফল হবেন।

এরপর আপনাকে আর দুশ্চিন্তায় ভুগতে হবে না। ক্লান্তি বা কষ্ট কোনোটাই থাকবে না। বরং অচিরেই আপনার প্রতিটি দিন প্রশান্তিময় ও সৌভাগ্যময় হবে। নিয়মানুবর্তিতা আপনার চরিত্রের ভূষণ হবে। অনুপম প্রশান্তি ও অতুলনীয় সৌভাগ্যের সাথে আপনার প্রতিটি দিন শেষ হবে।

মস্তিষ্কের সাথে পরামর্শ করবেন না

আপনার মস্তিষ্কের সাথে পরামর্শ করতে যাবেন না। সফল লোকেরা নিজেদের শক্তি মস্তিষ্কের সাথে পরামর্শ করার মাঝে ব্যয় না করে সরাসরি কাজে লেগে যান। তেমনই সালাত আদায়কারী মুমিনরাও সালাতের ব্যাপারে মস্তিষ্কের সাথে পরামর্শে যায় না।

এমনটা কখনো করবেন না যে,

এ কাজটা শেষ হলেই সালাতে চলে যাব।...

আগে খাবার খাব না সালাতে যাব?...

অজুর জন্য পায়ের জুতো খুললে অসুবিধে হবে কি?...

আর পাঁচটি মিনিট ঘুমিয়ে সতেজ হয়ে নিই, এরপর একদম তরতাজা শরীর নিয়ে ফজরের সালাত আদায় করা যাবে।

আপনার মস্তিষ্কের সাথে এমন পরামর্শে জড়াবেন না কখনো। কারণ এমন আপস-রফার পরামর্শ শক্তি ক্ষয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আর এটাই অলসতার প্রধান কারণগুলোর মধ্যে অন্যতম কারণ। সাইকোলজিস্টদের মতে, অলসতা ও কাজের বিলম্বতা থেকে বাঁচার উপায় হচ্ছে, আপনার মস্তিষ্ককে চুপ থাকতে বলে কাজ শুরু করে দিন। তাহলে অলসতা কাটিয়ে কাঙ্ক্ষিত কাজটা শুরু করতে পারবেন এবং কাজে ডুবে যেতে পারবেন।

অতএব যখনই আজান শুনবেন, তখনই আপনার মস্তিষ্ককে চুপ থাকতে বলে অজু করতে চলে যান। অজু শেষে সাথে সাথেই সালাতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। ভালো হয় যদি সালাত শেষ করার আগে কারও সাথে কথা না বলেন।

হতে পারে সালাতের আগে কথোপকথনে জড়ালে শয়তান অনুপ্রবেশ করবে এবং আপনাকে সালাত দেরি করতে বাধ্য করবে।

আপনি যে কাজই করেন না কেন অথবা যেখানেই থাকেন না কেন, আজান হলে তখন 'সালাত আদায় করবেন কি করবেন না' এমন কোনো পরামর্শেই জড়াবেন না আপনার মস্তিষ্কের সাথে। এটা নিয়ে চিন্তা করে নিজের শক্তি ক্ষয় করবেন না। আজানের সাথে সাথে সালাতে চলে যাওয়ার নফসের বিরুদ্ধে আপনার এ যুদ্ধটা আপনার নফসকে ইতিবাচক শক্তি দেবে। সময়ের পরিক্রমায় এটা আপনার অভ্যাসে পরিণত হবে। সালাত আদায়কারী ও সফল ব্যক্তিদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলোর মাঝে এটি অন্যতম।

এক নেককারের কথা। কৃষি কাজ করে জীবিকা আহরণ করতেন তিনি। তার স্বভাব ছিল, যখনই তিনি আজান শুনতেন, তখন যদি তার মাটি খোঁড়ার কোদাল মাথার ওপরে উত্তোলন করা ও কোদাল মারার জন্য প্রস্তুত থাকত, তবুও সে কোদাল মাটিতে আঘাত করত না। শয়তান সালাত বিলম্ব করার জন্য ওয়াসওয়াসা দেবে এ ভয়ে তিনি উত্থিত কোদালটা পেছনে ফেলে দিতেন। সামান্য একটা কাজ। কিন্তু এ কাজটা বুঝিয়ে দিয়েছে যে, সালাতের ব্যাপারে তিনি মস্তিষ্কের সাথে কোনো ধরনের আপসে যাবেন না। এখন সালাতের সময়, এখন সালাত আদায় করতে হবে। তার আগে কোনো কাজ করা যাবে না।

মসজিদের সাথে অন্তর লেগে থাকা এক শাইখের কথা। একদিন খুব ঝড় হচ্ছিল। বৃষ্টিও হচ্ছিল প্রচণ্ড। তার বাবা বললেন, 'মসজিদে গিয়ে কষ্ট করার দরকার নেই। বাড়িতেই সালাত পড়ে নাও।' কিন্তু শাইখ বললেন, 'আল্লাহর শপথ, যদি আকাশ থেকে পাথরের বর্ষণও হতো, তবুও আমি মসজিদে গিয়ে সালাত আদায় করা থেকে বিরত হতাম না, আর এ তো সামান্য বৃষ্টি।'

রেফারেন্স পয়েন্ট

এ শাইখের কাছে আমি জানতে চাইলাম, 'আত্মনিয়ন্ত্রণের জন্য তিনি এতটা শক্তি কোথায় পান? এর রহস্য কী? তিনি খোলাসা করে যা বললেন, আমি দেখলাম, একই জিনিসই তো মনোবিজ্ঞানীগণ তাদের বইপত্রে লিখে রেখেছেন। তার থেকে উন্মোচিত এ রহস্যকে এক কথায় বলা যায়, রেফারেন্স পয়েন্ট।

রেফারেন্স পয়েন্ট হচ্ছে আপনার অতীতে ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনা বা কাজ, যেখানে আপনি ব্যতিক্রম ও কঠিন পরিস্থিতিতেও সফল হয়েছেন।

এরপর থেকে যখনই একই রকম কঠিন পরিস্থিতিতে পড়বেন, তখন পূর্বের রেফারেন্স পয়েন্ট আপনাকে সাহস ও উৎসাহ দিয়ে কাজ করতে সহায়তা করবে এবং সফল করবে।

সেই শাইখের কথা। এক তীব্র ঠান্ডা রাত। অফিসের কাজ শেষ করতে করতে অনেক রাত হয়ে যায়। ক্লান্ত দেহ নিয়ে ঘরে এসে ঘুমিয়ে পড়েন তিনি। কিন্তু পর্যাপ্ত ঘুম হওয়ার আগেই ফজরের সালাতের আজান হয়ে গেল। বহু কষ্টে নফসের সাথে যুদ্ধ করে ঘুম ছেড়ে উঠলেন। অজু করে আতর মেখে মসজিদে চলে গেলেন।

তীব্র শীতের রাত, ঘুমের স্বল্পতা, ক্লান্তির আতিশয্যে পরিস্থিতি তার জন্য যথেষ্ট কঠিন ও কষ্টকর ছিল। এ রকম পরিস্থিতিতে কিছু না ভেবেই আমরা সালাত কাজা করে ফেলতাম। কিন্তু শাইখ কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করলেন। সফল হলেন। এরপর যখনই তিনি এ রকম পরিস্থিতিতে পড়বেন, তখন তিনি সে রাতের ঘটনাতে ফিরে যাবেন আর নিজেকে স্মরণ করিয়ে দেবেন যে, তিনি এমন পরিস্থিতিতেও ঘুম থেকে উঠে, অজু করে, সালাত আদায় করতে সক্ষম। এমতাবস্থায় তার নফস তার ওপর চড়াও হওয়ার জন্য কোনো কৌশলই খুঁজে পাবে না।

একইভাবে যখন আপনি নিজের ক্ষেত্রে এমন কিছু রেফারেন্স পয়েন্ট দাঁড় করিয়ে নেবেন, তখন এ রেফারেন্স পয়েন্টই আপনাকে আত্মনিয়ন্ত্রণ, নিয়মানুবর্তিতা ও সালাত আদায়ে সহায়তা করবে। তাই প্রতিটি কঠিন পরিস্থিতিকে এমনভাবে মোকাবিলা করুন, যেন তা আপনার জন্য রেফারেন্স পয়েন্ট হয়ে যায়।

আমাদের প্রিয় রাসুল ﷺ আদেশ করেছেন, আমরা যেন সাধ্যমতো সুন্নাত-নফল সালাত আদায় করি। কারণ যে মুমিন ফরজ সালাতের চেয়ে কয়েক গুণ বেশি সুন্নাত-নফল সালাত আদায় করতে পারে, তার ক্ষেত্রে ফরজ সালাত ছোটার আশঙ্কা নেই। এখান থেকে আমরা বুঝতে পারছি, আমাদের প্রিয় নবি ﷺ চাচ্ছেন আমরা যেন আত্মনিয়ন্ত্রণের জন্য প্রশস্ত বেষ্টনী তৈরির নীতি গ্রহণ করি।

এ সময় কেটে যাবে

এক রাজা তার মন্ত্রীকে আদেশ দিল একটা বিশেষ বাক্য খোদাই করে তার জন্য একটা আংটি বানাতে। যেন চিন্তিত অবস্থায় বাক্যটা পড়লে মনের উদ্বিগ্নতা কেটে যায়। আর সুখী অবস্থায় বাক্যটা পড়লে যথোচিত কাজটি করা যায়। রাজার আংটিতে লেখা হলো :

'এ সময় কেটে যাবে।'

অত্যন্ত সুন্দর মর্মবহ কথা। সব সময় এটা স্মরণে রাখবেন। ফজরের সালাতের সময় যদি ক্লান্তি লাগে, চোখে ঘুম জড়িয়ে থাকে, মনে রাখবেন, এ সময় কেটে যাবে। নিজেকে কয়েক মিনিট সময় দিতে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ুন এবং অজু করে মসজিদের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ুন। আপনার তন্দ্রা বা অবসাদ সারা দিন থাকবে না। সামান্য খারাপ লাগা কেটে যাবে আর পুরো দিন ক্লান্তিহীন কাজ করতে পারবেন। আপনার এ অবস্থাটা কেবল প্রাথমিক স্তরের, নতুন অভ্যাস তৈরির মারহালায় এমনটা হবে। সব ক্লান্তি ও অবসাদ অচিরেই কেটে যাবে।

এখন সালাতে যাওয়ার জন্য আপনাকে নিজের নফসের বিরুদ্ধে লড়তে হচ্ছে, অচিরেই এ সময়টা কেটে যাবে!

এখন খুশু-খুজুর সাথে সালাত আদায় না করার অপূর্ণতায় ভুগছেন আপনি, অচিরেই এ সময়টা কেটে যাবে!

আজ জুমাআর সালাতে গেলেন, কিন্তু মসজিদের ভেতরে জায়গা না পাওয়ায় বাইরে সূর্যের প্রখর তাপের নিচে কিংবা বৃষ্টির মাঝে দাঁড়িয়ে

আপনাকে সালাত আদায় করতে হলো, অচিরেই এ সময়টা কেটে যাবে।

আজ বেশি কাজের কারণে আপনি ক্লান্ত, আপনার নফস চাচ্ছে আরাম করতে, বাড়িতে এসে আরাম করতে শুয়েছেন মাত্র, তখনই সালাতের আজান হলো, উঠুন, সালাতে চলুন, অচিরেই এ সময়টা কেটে যাবে।

শুধু একটু ধৈর্য ধরুন!

এ সময়টা বেশি দীর্ঘ হবে না।

অচিরেই কেটে যাবে।

কিন্তু যাওয়ার আগে আপনাকে অন্য ব্যক্তিতে রূপান্তর করে যাবে।

এমন ধারণা করবেন না যে, যত দিন বেঁচে থাকবেন, ততদিন সালাতের জন্য একইভাবে আপনাকে নফসের বিরুদ্ধে লড়ে যেতে হবে।

নফসের বিরুদ্ধে এ সময়ের লড়াইটা সমাগত আত্মিক প্রশান্তির মূল্য মাত্র। কিছু সময়ের ব্যাপার। যখন সে সময়টা আসবে, যখন প্রশান্তি অর্জিত হবে, তখন আপনার মনে হবে, যেন পুরো পৃথিবীটাই আপনার।

অচিরেই আপনি এতটা প্রশান্তির মাঝে নিজেকে আবিষ্কার করবেন, যে প্রশান্তি হবে সীমাহীন, অপরিসীম। আপনি অভূতপূর্ব নিরাপত্তা অনুভব করবেন। তখন আপনি রোগের বিরুদ্ধে, বার্ধক্যের বিরুদ্ধে, দরিদ্রতার বিরুদ্ধে নিশ্চিত নিরাপত্তায় থাকবেন। সে সময়ে আপনার সব ভয় উবে যাবে বাষ্পের মতো। কারণ তখন আপনি আল্লাহ তাআলার সাথে যুক্ত থাকবেন। যদি আল্লাহ আপনার সাথে থাকেন, তাহলে আর ভয় কীসের!

আপনার কোনো প্রয়োজন আছে?!

আজান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়টা যেন এক জীবনের মতো দীর্ঘ। এ সময়টাতে মানুষ যা-ই চায়, তাকে তা-ই দেওয়া হয়। না দেওয়া হলেও, না দেওয়ার মাঝে হিকমত নিহিত থাকে। আশ্চর্য হই যখন দেখি, অনেক মানুষ দুআ কবুলের এ সুযোগটা অবহেলায় হারিয়ে ফেলছে। এমনকি অনেকে ভ্রূক্ষেপ পর্যন্ত করছে না।

আপনার কোনো প্রয়োজন আছে কি?!

আমাদের মধ্যে কে এমন আছে, যার চাওয়ার কিছু নেই?!

আপনার যা-ই প্রয়োজন থাকুক,

বিশ্বজগতের একচ্ছত্র অধিপতির সামনে আসুন—তাঁর কাছ থেকে চেয়ে নিন।

মহান অমুখাপেক্ষী সত্তা আল্লাহর কাছে চান, যিনি আসমানসমূহ ও জমিনের সকল ধন-সম্পদের ভান্ডারের একমাত্র মালিক।

আমার বিশ্বাস, বাকি আল্লাহই ভালো জানেন, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের বাধা-বিপত্তি ও চ্যালেঞ্জগুলোর অস্তিত্ব মূলত আমাদের ইমান নবায়নের জন্য। মানুষ 'ইমান নবায়ন' পরিভাষাটি অনেক শুনেছে, কিন্তু কখনো এর মর্মার্থ বোঝার চেষ্টা করেনি, বোঝার জন্য ততটা গভীরেও চিন্তা করেনি।

যদি কাউকে জিজ্ঞেস করেন যে, সে কি সত্যিই আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখে? আপনার এ প্রশ্ন সে মারাত্মক ঘৃণা করবে। আশ্চর্য হয়ে বলবে, কীভাবে আপনি তাকে এ প্রশ্নটা করতে পারলেন?! অবশ্যই সে মুমিন। আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী। বিবিধ ইবাদত পালন করে। আল্লাহ তাআলাকে ভালোবাসে।

কিন্তু একই ব্যক্তি তার দুরবস্থার অভিযোগ নিয়ে আপনার কাছে আসবে। তার জীবনের অসফলতা বা বুকের ওপর জগদ্দল পাথরের মতো চেপে থাকা সমস্যা কিংবা ঋণের বোঝার নিচে চাপা পড়ার অভিযোগ করবে আপনার কাছে। আপনি যখন তাকে নসিহত করবেন, আল্লাহর কাছে চাও; তখন সে আপনার নসিহত গ্রহণ করবে, তবে গৌণ কাজের কাতারে ফেলে দেবে সেটাকে।

আপনাকে বলবে, 'হ্যাঁ। আল্লাহর কাছে অবশ্যই চাইব। কিন্তু আমি যদি এরকম এরকম করি, তাহলে কেমন হয়?' সে সমস্যার সমাধানের জন্য জাগতিক মাধ্যম গ্রহণ করার কথা বলবে। যদি আপনি দ্বিতীয়বার তাকে নসিহত করেন যে, একমাত্র আল্লাহর কাছে চাও। সে বলবে, 'এটা তো তাওয়াক্কুল।[১০] আল্লাহ কি আমাদের মাধ্যম (আসবাব) গ্রহণের আদেশ করেননি!'

আপনি দেখবেন, মাধ্যম গ্রহণের নামে সে অমুকের কাছে ছুটে যাচ্ছে তার ছেলেকে একটা চাকরি পাইয়ে দেওয়ার জন্য, তমুকের দরজায় ধরনা দিচ্ছে সুপারিশ পাওয়ার জন্য। যার কাছে কিছু সীমিত জাগতিক ক্ষমতা আছে, তার কাছেই ছুটে যাচ্ছে, নিজের দুরবস্থার ফিরিস্তি তুলে ধরছে। আশ্চর্য! তারা সৃষ্টির কাছে চেয়ে যাচ্ছে; কিন্তু স্রষ্টার কাছে চাইছে না। সৃষ্টির কাছে স্রষ্টার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাচ্ছে। বিভিন্নভাবে বিভিন্ন উপায়ে তারা নিজেদের যাচনা ও অভিযোগ পেশ করছে মানুষের কাছে, স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল ভাষায় নিজেদের চাওয়া উপস্থাপন করছে তাদের সমীপে।

কিন্তু যখন আল্লাহর সামনে সিজদা করে, যিনি সকল কিছুর একচ্ছত্র অধিপতি...

যিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান...

---

১০. তাওয়াক্কুল-এর ক্ষেত্রে আসবাব গ্রহণ অপরিহার্য। কিন্তু কেউ যদি আসবাব গ্রহণ না করে তাওয়াক্কুল করার দাবি করে, তবে সে তাওয়াক্কুল করেনি; বরং সে তাওয়াকুল (التواكل) করেছে। আর তাওয়াকুল দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং এটি গর্হিত কর্ম। (অন্তরের আমল ১ম খণ্ড) - অনুবাদক।

যিনি আসমান-জমিনের সব ধনভাণ্ডারের মালিক...

তাঁর সামনে তাদের তোতলামো শুরু হয়ে যায়। তারা কীভাবে দুআ করে, কী দুআ করে সেটা নিজেরাই বোঝে না। আল্লাহর কাছে দুআ করাকে তারা গৌণ কাজ ধরে নিয়েছে। এটাকে অগুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করে এমনিই তালগোল পাকিয়ে তাড়াতাড়ি দুআ করছে দায়সারাভাবে।

আপনি জানেন, কেন তারা এমন করছে?

কারণ তারা ভিক্ষুকের কাছে ভিক্ষা চাইতে অভ্যস্ত। এক ভিক্ষুক আরেক ভিক্ষুকের কাছে চায়। যে ভিক্ষুক নিজের কোনো কিছুর ওপরই ক্ষমতাবান নয়, তার কাছে যাচনা করে। এমনকি যদিও কেউ দুনিয়ার সবচেয়ে বড় রাজা-বাদশাহর কাছেও চায় অথবা সবচেয়ে ক্ষমতাবান রাষ্ট্রপ্রধানের কাছেও চায়, তবুও 'ভিক্ষুক ভিক্ষুকের কাছে চায়' এ কথাটায় এতটুকুও পরিবর্তন আসবে না। কারণ এরা যত বড় ধনী বা যত বড় ক্ষমতাশালীই হোক না কেন, তাদের আসল পরিচয় হচ্ছে, তারা কোনো কিছুর ওপরই ক্ষমতাবান নয়। চোখের পলকে কবরের সংকীর্ণ গর্তে নিক্ষিপ্ত হতে পারে তারা। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

আমরা আসবাব গ্রহণের নাম করছি। কিন্তু আসবাব গ্রহণের মর্ম বুঝতে পারিনি। আসবাব গ্রহণের পেছনে পড়ে আসবাবের রবকে ভুলে বসেছি।

কোন আসবাব ইউনুস ﷺ-কে গভীর সাগরের গাঢ় অন্ধকারের মাছের পেট থেকে মুক্ত করেছিল? যদি তখন পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী বাদশাহ সর্বোচ্চ প্রস্তুতি নিয়েও আসত, তবুও কি সে বাদশাহ মাছের পেট থেকে ইউনুস ﷺ-কে মুক্ত করতে পারত?

কোন আসবাব শিকলে বাঁধা ইবরাহিম ﷺ-কে আগুনের কুণ্ডলী থেকে রক্ষা করেছিল?!

কোন আসবাব মুসা ﷺ-কে সামনে সাগর ও পেছনে ফিরআওন ও আক্রমণোদ্যত সেনাদলের উভয় সংকট থেকে রক্ষা করেছিল?!

কোন আসবাব সূর্যের আলো পৌঁছে না এমন কারাপ্রকোষ্ঠ থেকে মুক্ত করে ইউসুফ ﷺ-কে পৃথিবীর প্রভূত ধনভান্ডারের অধিপতি বানিয়েছে—মিসরের শাসনে বসিয়েছে?

কোন আসবাব সন্তানের প্রাণ সংশয়ের ভয়ে সন্তানকে সাগরের পানিতে ছুড়ে ফেলার শক্তি দিয়েছে মমতাময়ী মাকে?

শহরের অধিবাসীরা যখন একদল যুবককে হত্যা করার জন্য একত্রিত হয়েছিল, কোন আসবাব সে যুবকদলকে বাঁচিয়েছিল?

আপনি হয়তো বলবেন, 'এসবই নবি আলাইহিমুস সালামগণের মুজিজা ও নেককারদের কারামত। তাদের তুলনায় আমরা কোথায়! মুজিজার যুগ চলে গেছে।'

তবে আপনাকে বলব, মুজিজার পেছনে পড়ার কোনো কারণ নেই। আপনি যে প্রভুর ইবাদত করেন, যে প্রভুতে বিশ্বাস করেন, সে প্রভুই এসব মুজিজা ঘটিয়েছিলেন। যিনি তাঁদের মুক্তি দিয়েছিলেন, সেই প্রভু আপনাকেও মুক্ত করতে সক্ষম। যে প্রভু তাঁদের সমস্যার সমাধান করেছিলেন, সেই প্রভু আপনার সমস্যার সমাধান করতেও সক্ষম। যে প্রভু এক মায়ের অন্তরে শক্তি দিয়েছেন, সেই প্রভু এখনো আপনার অন্তরে শক্তি জোগাতে পারেন।

তাদবির ছেড়ে তাদাব্বুর করুন। আল্লাহ তাআলা অমুখাপেক্ষী, সকল কিছু করতে সক্ষম। মুজিজা ছাড়াই তিনি আপনাকে মুক্ত করতে, আপনার সমস্যা সমাধান করতে ও আপনার অন্তরকে শক্তি জোগাতে সক্ষম।

এই একই কথা বলেছিলেন মুসা ﷺ। মুসা ﷺ-এর সম্প্রদায় তাদের পেছনে ফিরআওন ও তার সেনাদলকে আসতে দেখল। তাদের সামনে উত্তাল সাগর, পেছনে ফিরআওনের সেনাদল। উভয় সংকটে তারা। সবাই মুসা ﷺ-কে বলল, 'আমরা তো ধরা পড়েই গেলাম।'[১১] মুসা ﷺ তখন আসবাব নিয়ে ভাবেননি। কোনো জাগতিক সরঞ্জামের কথা ভাবেননি। বরং তিনি প্রথমে ভেবেছেন আসবাবের রবকে নিয়ে। পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে আল্লাহর সামনে নিজেকে

---

১১. সুরা আশ-শুআরা, ২৬ : ৬১।

সঁপে দিয়েছেন। ভীত-শঙ্কিত সম্প্রদায়ের আশঙ্কার উত্তরে দৃঢ়চিত্তে বলিষ্ঠ কণ্ঠে বললেন :

كَلَّآ ۖ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ

'কখনো না, আমার রব আমার সঙ্গে আছেন, শীঘ্রই তিনি আমাকে পথনির্দেশ করবেন।'[১২]

كَلَّا শব্দটি নিষেধবাচক। কারও কথা প্রত্যাখ্যান করা, ধমক দেওয়া ও নিন্দা করার জন্য ব্যবহৃত হয় এ অব্যয়টি।

বাস্তবিকই মুসা ﷺ-এর এ শর্তহীন ইমান ও বিশ্বাসের পর কী আসবাব গ্রহণ করতে হবে, আল্লাহ তাআলা তাঁকে সেটা বাতলে দিলেন। যদিও আসবাব ছাড়াই আল্লাহ সমস্যার সমাধান করতে পারতেন। কিন্তু আল্লাহ এমনটা করেন না।

আল্লাহ ওহি করলেন মুসা ﷺ-এর কাছে, তিনি যেন তাঁর লাঠি দিয়ে সাগরে আঘাত করেন। লাঠির আঘাত ছাড়াই আল্লাহ তাআলা সাগরকে দুভাগে ভাগ করতে পারতেন। কিন্তু আমাদের আসবাব গ্রহণ করতে হবে তার প্রকৃত রূপটা স্পষ্ট করে দিতে চাইলেন তিনি। যে সকল আসবাব আমাদের সাধ্যের ভেতরে আছে, আমরা সেসব আসবাব গ্রহণ করে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করব। আল্লাহ তাআলা এখানে ফিরআওনকে ফিরে যেতে বলেননি বা তার সাথে আপস করতেও বলেননি। এমনটা আসবাব গ্রহণের বিপরীত হতো।

ইসলাম আপনাকে যে রকম ইমান আনতে বলেছে, এটা হচ্ছে সে ইমানের মর্মকথা। অর্থাৎ আপনার সাধ্যে যতটুকু কুলোয়, ততটুকু আসবাব গ্রহণ করবেন, তারপর আল্লাহর ওপর পূর্ণ বিশ্বাস রেখে তাওয়াক্কুল করবেন যে, আপনার রব অচিরেই আপনাকে করণীয় বাতলে দেবেন।

এ বিশ্বাসই নুহ ﷺ-কে তাঁর সম্প্রদায়ের নির্যাতন ও উপহাসের সামনে ধৈর্য ধরার শক্তি দিয়েছে। আপনি কি জানেন কেন নুহ ﷺ-এর সম্প্রদায় তাঁকে নিয়ে ঠাট্টা-উপহাস করেছিল?

---

১২. সুরা আশ-শুআরা, ২৬ : ৬২।

কারণ আল্লাহ তাআলা মরুভূমির মাঝখানে নৌকা তৈরির আদেশ দিয়েছিলেন। কাঠফাটা রোদে ধু ধু মরুভূমির মাঝে কোনো নৌকা কি চলতে পারে?! তাই নুহ ﷺ-কে তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা পাগল ঠাওরেছিল, তাকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করেছিল।

কিন্তু নুহ ﷺ সেসব নিয়ে ভাবেননি। কীভাবে, কোন আসবাব গ্রহণ করলে নৌকা যাত্রা করতে পারবে, সেসব নিয়ে তিনি চিন্তা করেননি। জাগতিক বিবেচনায়, যুক্তির বিচারে, সে অঞ্চলে নৌকা চলা অসম্ভব মনে হচ্ছিল। কিন্তু নুহ ﷺ আসবাবের নয়; বরং তিনি ভরসা করতেন আসবাবের রবের ওপর। فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ - 'অতঃপর তিনি তার পালনকর্তাকে ডেকে বললেন, "আমি অক্ষম, অতএব আপনিই এর প্রতিবিধান করুন।"'[১৩] তিনি আল্লাহর ওপর বিশ্বাস রেখেছেন, তাঁর ওপর ভরসা করেছেন, কারণ তিনি জানতেন, যে প্রভুর ইবাদত তিনি করেন, তিনি অসীম ক্ষমতার অধিকারী, তিনি পারেন না এমন কিছু নেই, সবকিছু করতে সক্ষম তিনি।

আল্লাহর পক্ষ থেকে সাড়া এল :

فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهَمِرٍ - وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ

'তখন আমি আকাশের দরজাগুলো খুলে দিয়ে মুষলধারায় বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম। আর জমিন থেকে উৎসারিত করেছিলাম ঝরনাধারা, অতঃপর (সব) পানি মিলিত হলো যে পরিমাণ (পূর্বেই) নির্ধারিত করা হয়েছিল।'[১৪]

এখানে আল্লাহ তাআলা মানুষের মুক্তির জন্য যে মাধ্যমটা রেখেছিলেন, সেটা হচ্ছে নুহ ﷺ ও তাঁর সাথি মুমিনদের পরিশ্রমে তৈরি নৌকা। এটা তাদের সাধ্যের মধ্যে ছিল। তারা নিজেদের সাধ্যমতো চেষ্টা-সাধনা করে মাধ্যম গ্রহণ করেছিলেন।

---

১৩. সুরা আল-কমার, ৫৪ : ১০।
১৪. সুরা আল-কমার, ৫৪ : ১১-১২।

জীবনভর আপনাকে আপনার সাধ্যমতো আসবাব গ্রহণ করতে হবে। কীভাবে সেসব আসবাব কাজ করবে, সেটা নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণ নেই। নুহ ﷺ নৌকা বানিয়ে মাধ্যম গ্রহণ করেছেন, কিন্তু তিনি চিন্তা করেননি যে, শুষ্ক মরুভূমিতে নৌকা চলবে কী করে; তাঁর গৃহীত মাধ্যম কীভাবে কাজ করবে, সে নিয়ে তিনি ভাবেননি। তিনি কেবল সাধ্যের মধ্যে যতটুকু ছিল ততটুকু আসবাব গ্রহণ করেছিলেন। আর আসবাব কীভাবে কাজ করবে, সে ব্যাপারটি কেবল আল্লাহই ভালো জানেন। তাই প্রত্যেক দিন নিজের ইমানকে নবায়ন করুন। যেন কখনো আপনি এ কথা ভুলে না যান যে, আল্লাহই হলেন এসব আসবাব থেকে উপকারদাতা।

আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও কাছে না

এ কথাটি বলেছিলেন আল্লাহর বন্ধু ইবরাহিম ﷺ। তখন তিনি শিকলাবদ্ধ বন্দী। কয়েক মাস ধরে তাঁর সম্প্রদায় যে অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত করছিল, সেখানে নিক্ষিপ্ত হওয়ার কয়েক মুহূর্ত আগের ঘটনা। এ আগুন এতটাই তীব্র ছিল যে, এর ওপর দিয়ে আকাশে উড়ে যাওয়া পাখিকেও ঝলসে ছাই করে ফেলত।

মূল ঘটনা, জিবরাইল ﷺ এলেন সাহায্য করতে। জিবরাইলের ছয়শ ডানা। তার একটি ডানাই আদিগন্ত বিস্তৃত। একটি ডানাই যথেষ্ট ছিল সে অগ্নিকুণ্ড নেভানোর জন্য। তিনি জানতে চাইলেন, 'আপনার কোনো কিছুর প্রয়োজন আছে?'

ইবরাহিম ﷺ আল্লাহ ছাড়া কারও কাছে কোনো কিছু চাওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন না, এটা তাঁর স্বভাবেই ছিল না। তিনি জবাব দিলেন, 'আপনার কাছে কোনো কিছু চাওয়ার নেই।'

ইবরাহিম ﷺ একটু পরই অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হবেন। তিনি জিবরাইল ﷺ-এর সাহায্য নিতে অস্বীকার করলেন। যার অন্তর মহা ক্ষমতাধর ও শক্তিমান আল্লাহর ওপর আস্থা রেখে প্রশান্ত আছে, তার অবস্থা এ রকমই হয়। আল্লাহর প্রতি তাঁর পূর্ণ বিশ্বাস ও সীমাহীন আস্থা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও কাছে কোনো কিছু না চাইতে তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছে।

সেদিন আগুন নিভিয়ে দিতে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ হয়নি। তাঁর সম্প্রদায়কে ঘরদোরসহ উড়িয়ে নিতে প্রবল বাতাসও আসেনি। ইবরাহিম ﷺ-কে আগুনের শাস্তি থেকে মুক্তির সুসংবাদ শোনাবে এমন কোনো কিছুই ঘটেনি। কিন্তু ইবরাহিম ﷺ জানতেন, আল্লাহ তাআলা মহাপ্রজ্ঞাময়, মহাদয়ালু। তিনি কিছুতেই তাঁকে ধ্বংস হতে দেবেন না। সবশেষে ইবরাহিম ﷺ-কে আগুনে নিক্ষেপ করা হলো। অতঃপর তিনি নিরাপদে সুস্থ অবস্থায় আগুন থেকে বেরিয়ে এলেন। এদিকে তাঁকে অক্ষত দেখে তাঁর সম্প্রদায় হতবাক হয়ে পড়ল। তাঁর বাবাও তখন সেখানে ছিলেন। তিনি কাফির ছিলেন। ইবরাহিম ﷺ-কে নিরাপদে বের হতে দেখে তাঁর বাবা আজার বললেন :

'ইবরাহিম, তোমার রবই শ্রেষ্ঠ।'

পূর্ণ বিশ্বাস ও সীমাহীন আস্থার সাথে নিজেকে আল্লাহর কাছে সঁপে দেওয়ার এ শাস্ত্র শিখে নিন, ভালো করে আয়ত্ত করে নিন। আল্লাহ তাআলা আমাদের এ আদেশ করেননি যে, আসবাব গ্রহণের নাম করে আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও কাছে হাত পাতব। আল্লাহ আমাদের যে আদেশ করেছেন সেটা হচ্ছে, আল্লাহ ছাড়া কারও কাছে কোনো কিছু না চেয়ে বরং আমরা আত্মবিশ্বাস নিয়ে নিজেদের সাধ্যমতো কাজ করব, যতটুকু আমাদের সাধ্যে কুলোয় ততটুকু আসবাব গ্রহণ করব।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন :

وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ

> 'আর তোমরা কাফিরদের মোকাবিলা করার জন্য যথাসাধ্য শক্তি প্রস্তুত করো।'[১৫]

আল্লাহর এ আদেশের ওপর আমল করা প্রয়োজন এবং সেটা নিজেদেরই করতে হবে। আল্লাহ এখানে শক্তি প্রস্তুত করার জন্য অন্যের কাছে সাহায্য চাইতে অথবা আমাদের থেকে আমাদের শত্রুদের প্রতিহত করার জন্য অন্যের সাহায্য চাইতে আদেশ করেননি। এমন কোনো কিছু করা আসবাব গ্রহণ নয়।

---

১৫. সুরা আল-আনফাল, ৮ : ৬০।

বরং সেটা তাওয়াক্কুল পরিপন্থী। তাই যদি আপনি কোনো কিছু চান, তবে সে কাজের জন্য নিজেকে যথাসাধ্য প্রস্তুত করুন এবং আল্লাহ তাআলার ওপর তাওয়াক্কুল করুন। তিনিই আপনার জন্য যথেষ্ট।

আল্লাহর সাথে অন্য কারও কাছে প্রার্থনা করবেন না, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও কাছে সাহায্য চাইবেন না। কুরআনে ভালো করে দেখুন, সুরা ফাতিহা থেকে নাস পর্যন্ত এমন একটা আয়াতও পাবেন না, যেখানে আল্লাহর সাথে অন্য কারও কাছে প্রার্থনা করতে বলা হয়েছে।

জীবনের প্রতিটি ছোট-বড় বিষয়ে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করার অভ্যাস গড়ে তুলুন। যদি কখনো মানুষের কাছে কিছু চাইতেই হয়, তাহলে আপনার চাওয়া যেন এমন কোনো জ্ঞানের ব্যাপারে হয়, যা আপনি জানেন না অথবা এমন কোনো নসিহতের ব্যাপারে হয়, যা আপনি শুনেননি। আপনার অন্তরে যেন বিন্দু পরিমাণেও এ কথা না থাকে যে, যে মানুষের কাছে চাচ্ছেন, সে বিষয়ে তার কোনো মালিকানা-কর্তৃত্ব আছে। চাই সে যত উচ্চ পদের বা যত শক্তিশালীই হোক না কেন। আপনার সকল কিছু একমাত্র মহা ক্ষমতাবান মহা শক্তিমান আল্লাহর হাতে।

জীবনের প্রতিটি দিন আপনার সামনে কোনো না কোনো প্রয়োজন আসে অথবা কোনো কাজ সহজকরণের দরকার হয় অথবা কোনো উদ্বিগ্নতা আপনার বুকের ওপর জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসে অথবা আপনি কোনো লক্ষ্য অর্জন করার চেষ্টা করেন অথবা কোনো নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা আদায় করতে চান অথবা কোনো কিছুর ভয় আপনাকে তাড়া করে কিংবা কোনো আপন কিছুর ক্ষতি হওয়ার ভয়ে ভীত থাকেন।...

এমতাবস্থায় আপনার সালাতকে সে সত্তার শরণাপন্ন হওয়ার জন্য মাধ্যম বানিয়ে নিন, যে সত্তা আসমান ও জমিনের মালিক। আপনি সালাতে সে সত্তার সামনে দাঁড়াচ্ছেন, যিনি সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। এ বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন তো?

আল্লাহ তাআলা সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। সকল কিছু, এ কিছু যে জিনিসই হোক না কেন। আপনার যা ইচ্ছে হয় আল্লাহর কাছে চান। আপনার

দৈনন্দিন উদ্বিগ্নতা ও সমস্যা নিয়ে প্রতিটি সালাতের সময় তাঁর সামনে আসুন। আজান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়টাতে মসজিদে চলে আসুন। এ সময়ের কয়েক রাকআত সালাতে আপনার সমস্যা ও উদ্বিগ্নতার সমাধান চেয়ে প্রার্থনা করুন।

আল্লাহর কাছে সৌভাগ্যের প্রার্থনা করুন। প্রশান্তির জন্য দুআ করুন। যে ভয়টা আপনাকে তাড়া করছে সেটার মোকাবিলায় তাঁর কাছে প্রার্থনা করুন, তিনি যেন আপনার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান। যা কিছুর নিরাপত্তার ভয় করছেন, তাঁর কাছে প্রার্থনা করুন, তিনি যেন সেটাকে হিফাজত করেন। যে কাজটা সম্পন্ন করতে চাইছেন সেটা সম্পন্ন করার তাওফিক প্রার্থনা করুন। আপনার ঋণ পরিশোধের জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা করুন। আপনার রিজিকে বরকত দিতে, নিয়ামত বাড়িয়ে দিতে প্রার্থনা করুন। প্রার্থনা করুন তিনি যেন আপনার মনে তাঁর ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেন, যেন তিনিও আপনাকে ভালোবাসেন।

যে প্রভু আসমানসমূহ, জমিন ও তার ধনভান্ডারের মালিক, তিনি আপনার জন্য তাঁর রাজত্বের কোনো কিছুই নিষিদ্ধ করেননি, আপনাকে বিপদগ্রস্ত করেননি, আপনার জন্য পৃথিবীকে সংকীর্ণ করেননি।

বরং আল্লাহ তাআলা বলেছেন :

مَّا يَفْعَلُ اللهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنتُمْ

'আল্লাহ কেনই বা তোমাদের শাস্তি দেবেন, যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও এবং বিশ্বাস স্থাপন করো?'[১৬]

দৈনন্দিন জীবনের বিপদাপদ ও চ্যালেঞ্জগুলোর পেছনে থাকা ইলাহি প্রজ্ঞা যদি আপনি বুঝতে পারেন, তবে আপনার অন্তর সীমাহীন প্রশান্তিতে ভরে যাবে। দৈনন্দিন জীবনে আসা বিপদাপদ ও চ্যালেঞ্জগুলো মূলত আপনাকে আল্লাহর সাথে খাঁটি সম্পর্ক গড়তে সাহায্য করে।

---

১৬. সুরা আন-নিসা, ৪ : ১৪৭।

আপনি তখন প্রকৃত সম্মান ও ইজ্জতের স্বাদ পাবেন, যখন আপনার প্রয়োজন পূরণের আরজি ফিরিয়ে দেওয়া হবে।[১৭] আপনি তখন প্রকৃত ইমানের অর্থ বুঝতে পারবেন। তখন আল্লাহর সাথে আপনার অন্য রকম সম্পর্কের সূচনা হবে। আর সালাত হবে আল্লাহর সাথে আপনার যোগাযোগের মাধ্যম।

যে সালাত কিছু মানুষের জন্য রুটিন ওয়ার্ক, সে সালাত হবে আপনার জীবন সংশোধনের, প্রয়োজন পূরণের, অন্তরের প্রশান্তি লাভের মাধ্যম। না, কেবল এতটুকুতেই সীমাবদ্ধ নয়। যে সালাত প্রাণসমৃদ্ধ, সে সালাতের উপকারিতা আরও অনেক অনেক বেশি।

যখন সূর্যে গ্রহণ লাগে, চাঁদ আলোহীন হয়ে যায়, জমিন শুকিয়ে চৌচির হয়ে যায়, যখন এমন কিছু ঘটে যার ব্যাপারে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় শক্তিশালী মানুষটিও কিছুই করার সামান্য সামর্থ্যও রাখে না, তখন আল্লাহ আমাদের সালাতে দাঁড়ানোর আদেশ দিয়েছেন, যে সালাতের ফলে পৃথিবীর অসহায় বাসিন্দাদের ক্ষমতার বাইরে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ঊর্ধ্বের মহাজাগতিক বিষয়াদিতেও পরিবর্তন আসে।

আল্লাহ আমাদের এমন সালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন, যে সালাত মহাজাগতিক মাপকাঠিতেও পরিবর্তন নিয়ে আসে। আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ ও বৃষ্টিপ্রার্থনার সালাতের বিধান দিয়েছেন। যে সালাত মহাজাগতিক ঘটনাকে পরিবর্তন করে দেয়, সে সালাত কেনই বা আপনার দুরবস্থা পরিবর্তন করতে পারবে না!

তিনি প্রজ্ঞাময়

আল্লাহ প্রজ্ঞাময়। আপনি যখন তাঁর কাছে দুআ করেন, তখন তিনি আপনার জন্য উত্তমটা বেছে নেন। কখনো কখনো আপনি যে বস্তুতে আপনার স্থূলদৃষ্টিতে কল্যাণ দেখেন, কিন্তু মহাপ্রজ্ঞাময় আল্লাহ সেটার অনিষ্ট সম্পর্কে জানেন বলে আপনার সে দুআ কবুল করেন না। আপনার দুআর প্রতিফলন না দেখলেও তার প্রতিদান আল্লাহ আপনার জন্য জমা রেখে দেন। এ জন্য অনেকে আল্লাহর

১৭. কারণ নশ্বর দুনিয়ার কোনো কিছু পাওয়ার পরিবর্তে চিরস্থায়ী জীবনের মর্যাদা উত্তম। - অনুবাদক।

কাছে দুআ করেও তাদের দুআর ফল দেখে না। যে কারণে তারা ধারণা করে বসেন যে, আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন না অথবা তাদের গুনাহের কারণে তাদের দুআ কবুল করছেন না। তাদের এ কুধারণা তাদের হতাশার দিকে ধাবিত করে, অন্য কারও কাছে হাত পাতার প্রতি প্ররোচিত করে।

কখনো কখনো দুআ কবুলের পরিপন্থী কিছু থাকলে দুআ কবুল হয় না। যেমন : আল্লাহর সাথে সাথে অন্য কারও কাছে প্রার্থনা করা অথবা আল্লাহর ক্ষমতার ওপর পূর্ণ বিশ্বাস না থাকা। আল্লাহ তাআলা হাদিসে কুদসিতে বলেন :

'আমি শিরককারীদের শিরক থেকে মুক্ত। যে ব্যক্তি কোনো আমলে আমার সাথে অন্য কাউকে শরিক করে, আমি তাকে ও তার শিরককে পরিত্যাগ করি।'[১৮]

'আল্লাহ আপনার দুআ শুনবেন না কিংবা কবুল করবেন না'—এই ধরনের ভুল ধারণা থেকে নিজের মনকে পবিত্র করুন। তিনি হলেন সর্বশ্রোতা! মনে রাখবেন, আপনি মহাক্ষমতাধর ও মহাপ্রজ্ঞাময় আল্লাহর সাথে মুআমালা করছেন। যত পারেন আল্লাহর কাছে চান। আর জেনে রাখুন, মহাপ্রজ্ঞাময় আল্লাহ যেটা কল্যাণকর, সেটা আপনার জন্য বেছে নেবেন।

নবি করিম ﷺ বলেছেন, 'বান্দার বিপদ কেটে যাওয়া নিকটবর্তী হওয়ার সময় তার হতাশা দেখে আল্লাহ হেসে ফেলেন।' সাহাবিগণ জিজ্ঞেস করেন, 'সত্যিই আল্লাহ হাসেন?' নবিজি ﷺ উত্তর দেন, 'হ্যাঁ। তিনি হাসেন।' তখন সাহাবিগণ বলেন, 'আল্লাহর কসম, আমরা এমন কাজ ত্যাগ করব না, যে কাজে আমাদের রব হাসেন।'[১৯]

---

১৮. সহিহু মুসলিম : ২৯৮৫।

১৯. বইয়ের কপিতে قنوت العبد (বান্দার আত্মসমর্পণময় আনুগত্য) শব্দটি এসেছে। লেখকের হাদিস উল্লেখ করার মাঝে ত্রুটি হয়েছে। সুনানু ইবনি মাজাহ (১৮১), মুসনাদু আহমাদ (১৬১৮৭) ও তাবারানি কৃত আল-মুজামুল কাবির (৪৬৯)-এ قُنُوطِ عِبَادِهِ (তার বান্দার হতাশা) শব্দ এসেছে। হাদিসটি জইফ। হাদিসের সনদে ওয়াকি বিন হুদুস নামে একজন রাবি আছেন। ইমাম জাহাবি তার আল-মিজান গ্রন্থে (৪/৩৩৫) বলেছেন, 'ওয়াকি বিন হুদুস—তাকে ইবনু আদাসও বলা হয়—একজন মাজহুল রাবি।' তবে শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. মাজমুউল ফাতাওয়াতে (৩/১৩৯) এ হাদিসটিকে হাসান বলেছেন।

রাতের বেলায় কোনো চিন্তা আপনাকে গ্রাস করছে, ঘুমের ঘোরে কোনো কিছু আপনাকে উদ্বিগ্ন করছে, তো জেগে উঠুন, ফজরের সালাতে সর্বনিয়ন্তা আল্লাহর সামনে সব খুলে বলুন। যে কাজটা করতে সকাল থেকে চেষ্টা করে যাচ্ছেন, কিন্তু তা সম্পন্ন হচ্ছে না, জোহরের সালাতে সকল কর্ম সহজকারী আল্লাহর সামনে তুলে ধরুন। এরপর যদি কোনো সমস্যাকে অসমাধানযোগ্য মনে হয়, তাহলে তা আসরের সালাতে মহাজ্ঞানী আল্লাহর কাছে উপস্থাপন করুন।...এভাবে আল্লাহকে বলুন আল্লাহ সব ঠিক করে দেবেন।

দুই ওয়াক্ত সালাতের মাঝে যে সমস্যায় পড়েন, সামনের সালাতে আল্লাহর কাছে সেটার কথা বলুন। যদি শয়তান এসে ওয়াসওয়াসা দেয় যে, আপনি গুনাহগার বা তেমন ইবাদতগুজার নন বলে আল্লাহ আপনার দুআ কবুল করবেন না, তাহলে তাকে প্রত্যুত্তর দিন :

أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ

'কে নিঃসহায়ের ডাকে সাড়া দেন, যখন সে ডাকে?'[২০]

আপনি যদি গুনাহ করে ফেলেন এবং সে কারণে আপনার মন হতাশায় ছেয়ে যায়, তাহলে মহাক্ষমাশীল আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিন। আর শয়তানকে শুনিয়ে দিন :

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ

'নিশ্চয় আল্লাহ তাওবাকারীদের ভালোবাসেন।'[২১]

শয়তানের কথায় কান দেবেন না। আল্লাহ সদা নিকটবর্তী সত্তা। তিনি সব সময় আপনার পাশে আছেন। আল্লাহ ও আপনার সম্পর্কের মাঝে শয়তানকে নাক গলাতে দেবেন না। আল্লাহ বলেন :

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ

২০. সুরা আন-নামল, ২৭ : ৬২।
২১. সুরা আল-বাকারা, ২ : ২২২।

'শয়তান তোমাদের দরিদ্রতার ভয় দেখায়।'[22]

যখনই শয়তান আপনাকে কুমন্ত্রণা দিতে আসে যে, অচিরেই আপনি দরিদ্র হয়ে যাবেন অথবা আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করবেন না, তখন শয়তানকে প্রত্যুত্তর দিন আল্লাহর ওয়াদা, আল্লাহর প্রেরিত ভালোবাসার সওগাত শুনিয়ে :

وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

'আল্লাহ নিজের পক্ষ হতে তোমাদের সাথে ক্ষমার ও অনুগ্রহের ওয়াদা করছেন এবং আল্লাহ প্রাচুর্যের অধিকারী, মহাজ্ঞানী।'[23]

বুঝে নিন, এখন থেকে মানুষের কাছে হাত পাতার কোনো প্রয়োজন নেই। আপনার জন্য প্রত্যেক দিন পাঁচটি মৌলিক সাক্ষাৎ নির্ধারিত আছে সে সত্তার সাথে, যিনি আসমান-জমিনের মালিক, যিনি সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান, যিনি সব করতে পারেন, আসমান ও জমিনের ভান্ডারসমূহ যাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন, যিনি জগতের নিয়ন্ত্রক সর্বনিয়ন্তা, যিনি বান্দাদের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণকারী, যিনি সকল কিছুর রক্ষক।

এসব সাক্ষাতের জন্য তিনিই আপনাকে তাঁর কাছে ডাকেন। অথচ তিনি অমুখাপেক্ষী, আর আপনি সব দিক থেকে তাঁর মুখাপেক্ষী। এসব সাক্ষাতের সময় আপনি যত দীর্ঘ আরজি পেশ করতে থাকুন না কেন, আপনি যতই পীড়াপীড়ি করুন না কেন, তিনি সাক্ষাৎ ছিন্ন করবেন না মোটেই। তিনি মহাজ্ঞানী, তাঁর সামনে আপনি গণ্ডমূর্খ। এসব সাক্ষাতের পর অচিরেই আপনি আপনার সমস্যার সমাধান পাবেন। মহাদাতা আল্লাহ আপনাকে এতটা প্রশান্তি দেবেন, যা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। যার কাছে প্রার্থনা করছেন, তাঁকে চিনতে ও জানতে পারার আনন্দ, আপনি যা চেয়েছেন সেটার পাওয়া-না পাওয়ার শূন্যতা ভুলিয়ে দেবে।

---

২২. সুরা আল-বাকারা, ২ : ২৬৮।
২৩. সুরা আল-বাকারা, ২ : ২৬৮।

যদি তোমার ওই দুচোখ আমার সৌন্দর্য দেখত! যে চোখগুলো দেখেছে অন্যদের কাছে ফিরে যায়নি আমাকে ছেড়ে।

যদি তোমার দুকান আমার সুন্দর সম্ভাষণ শুনত, তবে সব মোহের পর্দা পড়ে যেত আর তুমি আমার কাছে আসতে।

যদি তুমি ভালোবাসার বিন্দু পরিমাণ স্বাদ পেতে, তবে আমার ভালোবাসায় যারা প্রাণ দেয় তাদের মন বুঝতে পারতে।

অভ্যাসের চিকিৎসা

৯০-এর দশকের শুরুর দিকের কথা। একটি আমেরিকান কোম্পানির সিইও'র কাছে এক লোক আসলো। এ সিইও এডভারটাইজমেন্ট মার্কেটিংয়ের অগ্রদূত হিসেবে সমাদৃত তখন। নাম তার হপকিন্স। আগন্তুক তার কাছে সে সময়ের একটা নতুন বিজনেস আইডিয়া নিয়ে এসেছিল।

লোকটা হপকিন্সকে বলল, সে একটা আশ্চর্য পণ্য বানিয়েছে। আর সে এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, এ পণ্যটি অচিরেই চমৎকার সাফল্য অর্জন করবে। তাই সে হপকিন্সের সাহায্য চায় পণ্যটির এডভারটাইজমেন্ট ও লোকদের মাঝে এর ব্যবহারের প্রচলন ঘটানোর জন্য। শুনলে আশ্চর্য হবেন পণ্যটি ছিল টুথপেস্ট।

এডভারটাইজিং মার্কিটিংয়ের শীর্ষে তখন হপকিন্সের অবস্থান। তিনি অনেক অজ্ঞাত পণ্যকে বহুল প্রচলিত পণ্যে পরিণত করেছিলেন, যেসব পণ্য মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার মুনাফা এনে দিচ্ছিল কোম্পানিগুলোকে। যেসব পণ্য এতদিন অজ্ঞাত ও অখ্যাত ছিল, সেসব পণ্য আমেরিকার প্রায় প্রতিটি পরিবারই কিনতে লাগল তার মার্কেটিংয়ের বদৌলতে।

হপকিন্সের এত সফলতার কারণ ছিল, তিনি কাস্টমারদের মধ্যে নতুন অভ্যাস গড়ে তুলতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। নতুন পণ্যকে কেন্দ্র করে কাস্টমারদের মধ্যে নতুন অভ্যাস গড়ে তুলতেন, ফলে কাস্টমাররা এসব পণ্য কিনে নিত অনায়াসে।

হপকিন্সের মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি বিজনেস মার্কেটিংয়ের মৌলিক নীতিমালারূপে সমাদৃত হলো। বহু মার্কেটিং এজেন্সি, কোম্পানির মালিক, কারখানার মালিকসহ প্রমুখ হপকিন্স মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি প্রয়োগ করতে লাগল। কেবল সে সময়েই নয়, বর্তমানেও এসব স্ট্র্যাটেজি প্রয়োগ করা হয় এবং তার বেশ প্রভাবও রয়েছে আমাদের কেনাকাটার ওপর। আমরা কোন পণ্যটা কিনব, সেটার সিদ্ধান্তের ওপর বিশেষ প্রভাব রয়েছে এ হপকিন্স স্ট্র্যাটেজির।

লোকটার বিজনেস প্রোপোজাল শুনে সে সময়ের পরিস্থিতি বিবেচনায় হপকিন্স ভাবলেন, টুথপেস্ট উৎপাদন এক ধরনের বিজনেস সুইসাইড। দাঁত মাজার জন্য মানুষ কোনো কিছু কিনবে এটা সে সময় ছিল একেবারেই অচিন্তনীয়। সে সময়ে আমেরিকায় মানুষের দাঁতের ক্ষয় রোগ (RAMPANT CARIES)'র ছড়াছড়ি থাকা সত্ত্বেও টুথব্রাশ কেনা মানুষের সংখ্যা ছিল খুবই কম। আসলে তখন টুথব্রাশের ব্যবহারই বিরল ছিল। এ কারণে হপকিন্স সে লোকের প্রোপোজাল কয়েকবার প্রত্যাখ্যান করলেন। কিন্তু যখন লোকটার অনড় অবস্থান দেখলেন, তখন তিনি এগোবার সিদ্ধান্ত নিলেন। কিছু ব্যবসায়িক শর্ত আরোপ করে চুক্তি করে নতুন পণ্যের এড ক্যাম্পেইন শুরু করলেন।

পাঁচ বছরের মধ্যে হপকিন্স একটা অজ্ঞাত পণ্যকে বিশ্বব্যাপী বিখ্যাত করে তুললেন। আজকে তার ফলাফল আমরা দেখছি আমাদের চোখের সামনে। পেপসোডেন্ট নামের দাঁত মাজার পণ্যটা পুরো আমেরিকাব্যাপী অবাক করা দ্রুততায় ছড়িয়ে পড়ল। ১৯৩০'র শুরুর দিকে এটি চীন, দক্ষিণ আফ্রিকা, ব্রাজিল, জার্মানি প্রভৃতি দেশে বিক্রি হতে লাগল। এমনকি তখন প্রায় পুরো বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল এটি।

পেপসোডেন্টের প্রথম এড ক্যাম্পেইনের ১০ বছর পরের কথা। যখন সমীক্ষা পরিচালনাকারীদের মতামত সামনে এল, সমীক্ষায় প্রকাশ পেল, ব্রাশ দিয়ে দাঁত মাজা আমেরিকান জাতির জীবনাচারের অন্যতম অনুষঙ্গে পরিণত হয়েছে। ব্রাশ দিয়ে দাঁত মাজাকে দৈনন্দিন জীবনের অভ্যাসে পরিণত করতে সফল হয়েছেন হপকিন্স।

পরবর্তী সময়ে হপকিন্স গর্ব করে বলেছিলেন, 'টুথপেস্ট দিয়ে ব্রাশ করাকে কাস্টমারদের দৈনন্দিন জীবনের একটি অভ্যাসরূপে গড়ে তুলতে পারার পেছনের রহস্য হচ্ছে, এমন একটি অনুঘটক উদঘাটন করা, যেটা কাস্টমারদের প্রতিদিন দাঁত ব্রাশ করতে প্রণোদনা দেবে। এমনকি এটাতেই সীমাবদ্ধ থাকা যাবে না। কাস্টমারদের একটি তাৎক্ষণিক পুরস্কার প্রাপ্তির অনুভূতি দেওয়াও জরুরি ছিল। যাতে টুথপেস্ট দিয়ে দাঁত মাজা তাদের অটোমেটিক অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়।'

বর্তমানে সারা বিশ্বে একই স্ট্র্যাটেজি ব্যবহার করছে ভিডিও গেইম ডিজাইনাররা, ফুড কোম্পানিগুলো, ফাস্টফুড শপগুলো, মিলিয়ন মিলিয়ন সেল্‌স রিপ্রেজেন্টেটিভ।

একটা থ্রিলার গল্প হয়ে গেল। পাঠকের মনে প্রশ্ন আসতে পারে, কিন্তু হপকিন্সের এ উদঘাটনের সাথে সালাতের সম্পর্ক কী?!

এ প্রশ্নের জবাব পেতে হলে আমাদের জানতে হবে হপকিন্স মূলত কী করেছিলেন! হপকিন্স যে কাজটা করেছিলেন সেটা কেবল এডভারটাইজমেন্টের জন্যই গ্রেট আইডিয়া ছিল না; বরং তার এ স্ট্র্যাটেজিটা একটি সাইন্টিফিক প্রিন্সিপাল আমাদের সামনে তুলে ধরে। যার মাধ্যমে আমরা হিউম্যান সাইকোলজির রহস্য সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পাব এবং তা কীভাবে সামলাতে হয়, সেটা জানতে পারব।

হ্যাভিট ট্রিগার

পেপসোডেন্ট বেচার জন্য হপকিন্সের এমন একটা হ্যাভিট ট্রিগার (অভ্যাস অনুঘটক) প্রয়োজন ছিল, যে হ্যাভিট ট্রিগারটা টুথপেস্ট ব্যবহার মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অভ্যাসে পরিণত করার জন্য যৌক্তিক সমর্থন দেবে।

দন্তচিকিৎসার এক স্তূপ বই নিয়ে বসলেন হপকিন্স। একটা বই পড়তে পড়তে তার কাজের তথ্যটা পেয়ে গেলেন। তথ্যটা হচ্ছে, মানুষের মুখের ভেতর এমন একটা শ্লেষ্মা ঝিল্লি[২৪] রয়েছে যেটা দাঁতগুলোকে ঢেকে রাখে। খাবার খাওয়ার

২৪. ইংরেজিতে Mucous Membrane। - অনুবাদক।

পর খাবারের কিছু অংশ এ শ্লেষ্মা ঝিল্লির সাথে লেপ্টে থাকে। ফলে ঝিল্লির রং শাদা থেকে হলুদ বর্ণ ধারণ করে। সঠিকভাবে পরিষ্কার না করলে দাঁতের ফাঁকে ব্যাকটেরিয়ার জন্ম নেয়। যার কারণে দাঁতের ক্ষতি হয় এবং ধীরে ধীরে দাঁতের ক্ষয়রোগ (CARIE) হয়।

হপকিন্স এ তথ্যটা কাজে লাগালেন। তিনি দাঁত মাজার প্রতি আগ্রহ তৈরি করতে দাঁতের আবরণের ঝিল্লিটাকে হ্যাবিট ট্রিগার বা রিমাইন্ডার হিসেবে ব্যবহার করলেন। পেপসোডেন্টের একটি এডভারটাইজমেন্টে বলা হয়েছিল, 'আপনাদের দাঁতের ওপর জিহ্বাটা একবার ঘুরিয়ে আনুন। একটা ঝিল্লির হদিস পাবেন। এটা আপনার দাঁতকে রুগ্‌ণ করে এবং দাঁতের ক্ষয়রোগ ঘটায়।'

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে, দাঁতের ওপরের ঝিল্লিটা আপনা থেকেই দাঁতের ক্ষয়রোগের কারণ নয়। বরং ঝিল্লির সাথে খাবারের যে উচ্ছিষ্ট লেগে থাকে সেটা পরিষ্কার না করার কারণে দাঁতের ক্ষয়রোগ হয়। হপকিন্স এ সত্যটা এড়িয়ে কেবল ঝিল্লি শব্দটা ব্যবহার করে এ্যাডভারটাইজমেন্টটা করলেন মানুষ যেন সহজে বুঝতে পারে। যেন তার এডভারটাইজমেন্টের এটাচমেন্ট ভালো হয়।

একইভাবে আমরাও দৈনন্দিন জীবনে অভ্যাস হিসেবে যেসব কাজ করি, সেসবের প্রায় ক্ষেত্রেই আমরা হ্যাবিট ট্রিগার বা রিমাইন্ডার পাই। যেমন : ক্ষুধার অনুভব খাবার গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে আমাদের রিমাইন্ডার দেয়।

অন্যদিকে ভোজনপ্রিয়দের ক্ষেত্রে খাবারের ঘ্রাণ অথবা খাবার দেখাই একটা শক্তিশালী ট্রিগার হিসেবে কাজ করে। এমনকি ক্ষুধা না লাগলেও এ ট্রিগারটা তাদের খাবার গ্রহণের ইচ্ছাকে শক্তিশালী করে।

তাই আমরা অভ্যাসবশত যেসব কাজ করি, সেসব অভ্যাসের ক্ষেত্রে হয় কোনো রিমাইন্ডার কাজ করে অথবা কোনো হ্যাবিট ট্রিগার কাজ করে, অথবা উভয়টা একই সাথে কাজ করে। এ বিষয়টা খারাপ অভ্যাসগুলোর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। উদাহরণত ধূমপান করা। ধূমপায়ীদের ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে শরীরের ভেতরে নিকোটিনের ঘাটতির অনুভূতি রিমাইন্ডার হিসেবে কাজ করে। এ রিমাইন্ডার ধূমপায়ীকে সিগারেট খাওয়ার প্রতি ধাবিত করে। এমনকি কারও নিকোটিনের

ঘাটতি অনুভব না হলেও কাউকে সিগারেট খেতে দেখা অথবা ধূমপায়ীদের সাথে বসা তার সিগারেট খাওয়ার হ্যাভিট ট্রিগার হিসেবে কাজ করে।

রিওয়ার্ড

হপকিন্স জানতেন, হ্যাভিট ট্রিগার (অভ্যাস অনুঘটক)-এর পাশাপাশি আরেকটা জিনিস যোগ করতে হবে, যেটা অভ্যাস গঠনের কাজটাকে পূর্ণতা দেবে এবং টুথপেস্ট দিয়ে দাঁত মাজা মানুষের দৈনন্দিন অভ্যাসে পরিণত করবে। তাই এমন একটা রিওয়ার্ড বা পুরস্কারের ব্যবস্থা করতে হতো, যেটা কাস্টমার দাঁত মাজার সাথে সাথেই পেয়ে যাবে। এবং এ পুরস্কার বা রিওয়ার্ডের জন্য সে আবার দাঁত মাজতে টুথপেস্ট ব্যবহার করতে চাইবে।

দাঁতের অন্যান্য পণ্যের বিপরীতে পেপসোডেন্টে বাড়তি কিছু ক্যামিক্যাল যুক্ত করা হয়েছিল। সাইট্রিক এসিড, আরও ছিল পেপারমিন্ট অয়েল ও অন্য কিছু ক্যামিক্যাল ম্যাটেরিয়াল। পেপসোডেন্টে এসব এ জন্য ব্যবহার করা হচ্ছিল, যেন দাঁত মাজার সময়ে কাস্টমার একটা সতেজ স্বাদ পায়। এবং যেন দাঁত মাজার পর এ সতেজতার অনুভূতি জিহ্বা ও মাড়ির ওপর থেকে যায়।

পেপসোডেন্ট বাজার দখল করে ফেলল। একটা পণ্যের এত দ্রুত প্রসার হওয়ার কারণ খুঁজতে গবেষকরা উঠে পড়ে লাগলেন। তারা জানতে পারলেন, ভোক্তারা বলেছে যে, যখন তারা পেপসোডেন্ট দিয়ে দাঁত মাজতে ভুলে যায়, তখন তারা মুখের ভেতরের সতেজতা ও প্রাণবন্ত অনুভূতিটা পায় না। আর যখন তারা এ অনুভূতির অনুপস্থিতি দেখে, তখন তারা বিশ্বাস করতে থাকে যে, তাদের মুখ অপরিষ্কার। তাই তারা দ্রুত গিয়ে পেপসোডেন্ট দিয়ে দাঁত মাজে।

এসব ম্যাটারিয়ালে যদিও চিকিৎসাগত কোনো উপকারিতা নেই, কিন্তু এসব ম্যাটারিয়াল মানুষকে এ কথা মানিয়ে ছাড়ে যে, পেপসোডেন্ট টুথপেস্ট দাঁত মাজার কাজটা সবচেয়ে উত্তমভাবে সম্পন্ন করে।

ফলে মানুষের নতুন অভ্যাস গঠনের ক্ষেত্রে হ্যাভিট ট্রিগার ও রিওয়ার্ড দুটি মৌলিক চালিকাশক্তি হিসেবে প্রমাণিত হয়।

নিউ মেক্সিকো ইউনিভার্সিটিতে ২৬৬ জন মানুষের ওপর একটা গবেষণা চালানো হয়। তাদের কাজ ছিল নিয়মিত ব্যায়াম করা। তাদের অধিকাংশই সপ্তাহে কমপক্ষে তিনবারের বেশি ব্যায়াম করে।

ফলাফলে দেখা গেছে, গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিরাট সংখ্যক মানুষ বলেছে, তারা ব্যায়াম করেছিল এ কারণে যে, ব্যায়াম তাদের একটা নতুন অনুভূতি দিয়েছিল। যেটাকে অন্য ভাষায় রিওয়ার্ড বা পুরস্কার বলা যায়। ব্যায়ামের ফলে শরীর এন্ড্রোপিন উৎপন্ন করে। এন্ড্রোপিন উৎপন্ন হওয়ার সুন্দর অনুভূতির আশায় তারা ব্যায়ামের প্রতি আগ্রহ পেত। শরীরে উৎপন্ন এ এন্ড্রোপিন শারীরিক কষ্ট লাঘব করা ও আরামদায়ক অনুভূতি দেওয়ার কাজ করে। অন্যদিকে অংশগ্রহণকারীদের অন্য দল বলেছে, ব্যায়াম করার পরে তারা একটা কিছু অর্জনের অনুভূতি (রিওয়ার্ড) পায়।

মোটকথা, এরা অর্জন ও সাফল্যের অনুভূতি পাওয়ার আশায় ব্যায়ামের প্রতি আগ্রহ পেত। উভয় অবস্থায় আমরা দেখছি, এখানে তাৎক্ষণিক পুরস্কার এ সকল অংশগ্রহণকারীদের ব্যায়ামের অভ্যাস গড়ে ওঠার কারণ হিসেবে কাজ করেছে।

অভ্যাস ও সালাত

সালাত এমন একটি কর্ম, যা আমরা দিনে-রাতে কয়েকবার সম্পাদন করে থাকি। তাই আমরা চেষ্টা করব সালাতের জন্য উঠে যাওয়া যেন আমাদের অভ্যাসে পরিণত হয়। আমরা যেন বিনা কষ্টে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সালাত আদায় করতে যেতে পারি। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমরা যেন আজান শোনার সাথে সাথে মস্তিষ্কের সাথে লড়াইয়ে না জড়িয়ে অনায়াসে অজু ও সালাতের জন্য যেতে পারি।

আমি এখানে সালাতের জন্য উঠে যাওয়াকে উদ্দেশ্য করছি। খোদ সালাতকে উদ্দেশ্য করছি না। কারণ সালাত আমাদের অভ্যাস হওয়া উচিত নয়। আমরা যে কাজে অভ্যস্ত সেটা আমাদের দ্বারা অবচেতনভাবে হয়ে যেতে পারে। কিন্তু সালাত আদায় করতে হবে সচেতনভাবে, মনোযোগের সাথে এবং পূর্ণ মন দিয়ে। তা ছাড়া সালাত দৈনন্দিন জীবনের নিয়মিত কর্ম, কারণ এটি প্রতিদিন

বারবার আদায় করতে হয়। আমি এখানে 'সালাতের অভ্যাস' শব্দগুচ্ছের প্রচলিত মর্ম উদ্দেশ্য করছি না যে, সালাত ইবাদতের পরিবর্তে আদত হয়ে যাক—এমনটা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। বরং আমরা এখানে অভ্যাসের বৈজ্ঞানিক মর্ম তুলে ধরছি। অভ্যাস হচ্ছে এমন একটি কর্ম, বারবার চর্চার মাধ্যমে যেটাতে মানুষ অভ্যস্ত হয়ে যায়।

অভ্যাস তৈরির গঠণপ্রণালী বোঝার জন্য গবেষকদের গবেষণার মাধ্যমে আমরা ইতিপূর্বে যেমনটা উল্লেখ করেছি, সে নিয়মটা অনুসরণ করতে হবে। একজন মানুষ যখন একটা উপকারী অভ্যাস গড়ে তুলতে চায়, তখন তাকে হ্যাবিট ট্রিগার (অভ্যাস অনুঘটক) ও রিওয়ার্ড (পুরস্কার) দুটি মূলনীতি বাস্তবায়ন করতে হবে। হ্যাবিট ট্রিগার অভ্যাসের কাজটি করতে ইচ্ছা জাগাবে। আর রিওয়ার্ড এ অভ্যাসটি বারবার পুনরাবৃত্তি ঘটার দায়িত্ব নেবে।

বিগত পরিচ্ছেদগুলোতে আমরা যা আলোচনা করেছি, সেসব হচ্ছে, হ্যাবিট ট্রিগার, যা সালাত আদায়ের জন্য উঠে পড়তে আমাদের ইচ্ছাকে শক্তিশালী করবে। আর আমরা যেন সালাতের পাবন্দ হই, নিয়মিত সালাত আদায় করি, যাদের সালাত ছুটে না তাদের একজন হতে পারি, সে লক্ষ্যে আল্লাহ আমাদের জন্য একটা ইনস্ট্যান্ট রিওয়ার্ড দিয়ে রেখেছেন। প্রতি ওয়াক্ত সালাতের পর সাথে সাথে পাওয়া এ রিওয়ার্ড পরবর্তী ওয়াক্তের আশায় অপেক্ষা করতে আমাদের বাধ্য করে। আমাদের অবস্থা তখন এমন হয়ে যায়, যার প্রকাশ হাদিসের মাঝে প্রিয় নবি ﷺ-এর মুখে—সালাতের সময় হলে তিনি বিলাল ؓ-কে বলতেন : (يَا بِلَالُ أَقِمِ الصَّلَاةَ أَرِحْنَا بِهَا) 'ইকামত দাও; সালাতের মাধ্যমে আমাদের প্রশান্ত করো, হে বিলাল!'[২৫]

এ রিওয়ার্ডের নাম হচ্ছে সাকিনা, অন্তরের প্রশান্তি।...

আরও খুলে বলতে গেলে, খুশু-খুজুর সাথে সালাত আদায়ের পর অন্তরে যে সুখানুভূতির সঞ্চার হয়, সে প্রাণবন্ত অনুভূতির নাম সাকিনা। যেসব অনুভূতি দুনিয়ার জীবনে পাওয়া সম্ভব সেগুলোর মাঝে খুশুময় সালাত আদায়ের পরের এ প্রশান্তির অনুভূতিই শ্রেষ্ঠ। প্রশান্তির এ অনুভূতিই হচ্ছে সালাত আদায়ের পরে প্রাপ্ত রিওয়ার্ড।

---

২৫. সুনানু আবি দাউদ : ৪৯৮৫; হাদিসের মান : সহিহ।

যে অধম বান্দা আপনাদের জন্য এই কথাগুলো লিখছে, সে আপনাদের সামনে কেবল বাস্তবতা বিবর্জিত কিছু একাডেমিক থিউরি তুলে ধরছে না। আবার সে এমন মানুষও নয়, যে দুনিয়ার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও ভোগবিলাস থেকে বঞ্চিত কিংবা দুনিয়ার সাধ-আহ্লাদ সম্পর্কে বেখবর। বরং আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তাআলা আমাকে প্রচুর হালাল ধন-সম্পদ দিয়ে ধন্য করেছেন। এত কিছুর পরও সালাতের অনুপম প্রশান্তির অনুভূতির মতো মধুর কোনো অনুভূতি আমি পাইনি। এটি যেন দুনিয়াবি সুখ-সমৃদ্ধির চিকিৎসা : এই মধুর অনুভূতি ছাড়া দুনিয়ার চাকচিক্যে কোনো আনন্দ নেই; এমনকি এই মধুর অনুভূতির উপস্থিতিতে দুনিয়াবি দুঃখ-দুর্দশায়ও কোনো কষ্ট ও হতাশা নেই।

আল্লাহ তাআলা দুনিয়াকে সুখ ও সৌভাগ্যের উৎস বানাতে চাননি। কারণ তিনি ন্যায়পরায়ণ। তিনি যা করেন, তা-ই ন্যায়। তিনিই পরম ইনসাফকারী। দুনিয়ার ধন-সম্পদের মালিকানার ক্ষেত্রে সকল মানুষ সমান নয়। কিন্তু মহাজ্ঞানী আল্লাহ তাআলা সুখ-সৌভাগ্য রেখেছেন সাকিনা বা অন্তরের প্রশান্তির মধ্যে। আমরা অন্তরের প্রশান্তি লাভের পথ জানি। অতএব যে চায়, সে যেন উক্ত পথ অবলম্বন করে তা অর্জন করে নেয়।

অন্তরের প্রশান্তি থাকলে কপর্দকহীন হয়েও রিক্তহস্ত মানুষ সুখ ও সৌভাগ্য অনুভব করে। অন্যদিকে অন্তরের প্রশান্তি না থাকলে সবকিছুর মালিক হয়েও বড় ধনী মানুষটিও নিজেকে হতভাগা মনে করে। অন্তরের প্রশান্তি থেকে বঞ্চিত হলে দুনিয়ার সকল নিয়ামতকে শাস্তি মনে হয়।

আমি তাওবাকারীদের সাথে ওঠাবসা করেছি। দুনিয়ার অনেক ভোগসামগ্রী উপভোগের পরে যারা আল্লাহর পথে ফিরে এসেছে, এমন তাওবাকারীদের সাথে কথা বলেছি। তাদের কাছে জানতে চাইলাম, কেন আপনারা আল্লাহর দিকে ফিরে এলেন? তারা জানালেন, আমরা আল্লাহর নৈকট্যের মাঝে এমন স্বাদ পেয়েছি, সে স্বাদের সাথে দুনিয়ার কোনো স্বাদের তুলনাই হয় না।

একইভাবে মহা ক্ষমতাধর আল্লাহর শক্তির বদৌলতে আপনি যখন অন্তরের প্রশান্তি অনুভব করতে শুরু করবেন, তখন আপনার মনে হবে যেন আপনি পুরো দুনিয়াটারই মালিক বনে গেছেন। শাইখ মুহাম্মাদ রাতিব নাবলুসি বলেন,

'অন্তরের প্রশান্তি থাকলে মানুষ কাঁটার বিছানাতেও ঘুমোতে পারে। অন্তরের প্রশান্তির কারণে তার জন্য সে বিছানা আরামদায়ক হয়ে যায়। অন্যদিকে অন্তরের প্রশান্তি থেকে বঞ্চিত মানুষ নরম-কোমল রেশমের বিছানায় শুয়েও ঘুমোতে পারে না। তার জন্য সে বিছানা কাঁটাময় বিছানার মতো হয়ে যায়।

অন্তরের প্রশান্তি থাকলে কঠিনতর পরিস্থিতিও শান্তিময় ও সহজ হয়ে যায়। অন্যদিকে অন্তরের প্রশান্তি না থাকলে সহজতর পরিস্থিতিও কষ্টকর ও কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

অন্তরের প্রশান্তি থাকলে ভীতিকর স্থান ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজেও নিরাপত্তা ও শান্তি পাওয়া যায়। অন্যদিকে অন্তরের প্রশান্তি না থাকলে নিরাপদ পথকেও বিপজ্জনক ও সর্বনাশা মনে হয়।

অন্তরের প্রশান্তির সাথে আল্লাহ রিজিককে প্রসারিত করেন। তখন তা উত্তম উপভোগ্য মনে হয়। প্রভূত সুখ বয়ে আনে। দুনিয়াতে সুখের প্রাচুর্য এনে দেয়। আখিরাতের পাথেয় হয়।

অন্যদিকে প্রশান্তিশূন্য রিজিক দুশ্চিন্তা ও ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। হিংসা ও শত্রুতা ডেকে আনে। কখনো কখনো এর সাথে কৃপণতা বা রোগের বঞ্চনা যুক্ত হয়। কখনো কৃপণতার কারণে খেতে পারে না। কখনো রোগের কারণে ক্ষতির ভয়ে খেতে পারে না। আবার কখনো বাড়াবাড়ি ও বেখেয়ালের কারণে রিজিকের সবটা ধ্বংস হয়ে যায়।

অন্তরের প্রশান্তির সাথে আল্লাহ সন্তানসন্ততি দান করলে তারা দুনিয়ার জীবনের শোভা হয়। আনন্দ ও সুখের উৎস হয়। নেককার উত্তরসূরি রেখে গেলে তারা আখিরাতের পুঁজি হয়, নেকের পরিমাণ কয়েকগুণে বর্ধিত হয়। অন্যদিকে আল্লাহর এ রহমত থেকে বঞ্চিত হলে সন্তানসন্ততি পরীক্ষা, দুঃখ, দুর্দশা, দুর্ভাগ্য, দুশ্চিন্তায় রাত জাগা ও দিনের ক্লান্তির কারণ হয়।

আল্লাহ তাআলা অন্তরের প্রশান্তির সাথে সুস্বাস্থ্য ও সুস্থতা দান করলে, তা হয় নিয়ামত ও সুন্দর জীবন। অন্যদিকে অন্তরের প্রশান্তি না থাকলে সুস্বাস্থ্য

ও সুস্থতাও বিপদ হয়ে দাঁড়ায়। এই সবল ও সুঠাম দেহ নিয়ে সে আল্লাহর নাফরমানিতে লিপ্ত হয়, গুনাহে মত্ত হয়ে নিজের আত্মাকে কলুষিত করে।

আল্লাহ তাআলা অন্তরের প্রশান্তির সাথে শক্তি ও মর্যাদা দিলে, সেটা হয় সংশোধনের মাধ্যম, নিরাপত্তার উৎস, উত্তম আমল সঞ্চয়ের কারণ। অন্যদিকে অন্তরের প্রশান্তি থেকে বঞ্চিত হলে শক্তি-মর্যাদা হয়ে পড়ে দুশ্চিন্তার উৎস, গুনাহ ও অবাধ্যতা, হিংসা ও শত্রুতার কারণ। প্রশান্তিহীন শক্তি ও মর্যাদা তাকে কোনো রকমের স্থিরতাই দেয় না। উল্টো সে এ দুটোর মাধ্যমে জাহান্নামের পুঁজি সঞ্চয় করে।'

অন্তরের প্রশান্তি যদি জ্ঞান, বুদ্ধি, স্বাস্থ্য, সম্পদ, সুখ্যাতি ও প্রতিপত্তি দিয়ে অর্জন করা না যায়, তবে তা অর্জনের উপায় কী?

খুশু : অন্তরের প্রশান্তি অর্জনের উপায়

খুশুময় সালাত অন্তরে প্রশান্তি আনে। অন্তরের এ প্রশান্তি আপনাকে সালাতের প্রতি আগ্রহী করে তোলে। খুশু সে অভ্যাসের ওষুধ। সালাতের সাথে খুশুর সমন্বয় সালাতকে একটি অভ্যাস ও রুটিনের কাজ থেকে আলাদা করে অন্যরকম ইবাদতে পরিণত করে।

অনেকে ধারণা করে যে, যারা নিয়মিত সালাত আদায় করতে পারেন তাদের বিশেষ বায়োলজিক্যাল ক্ষমতা আছে অথবা তারা আসমানি শক্তিপ্রাপ্ত, যা আকাশ থেকে এমনিই তাদের ওপর নাজিল হয়েছে। আবার অনেকে ধারণা করেন যে, খুশু হচ্ছে এমন এক আসমানি বিষয়, যা আল্লাহ যাকে চান তাকে দান করেন। তাই অনেকে জিজ্ঞেস করে, 'কোথায় খুশু? কেন আমি সালাতে খুশু অনুভব করি না?'

খুশু কোথায়—এ প্রশ্নের উত্তর জানতে কিছু মানুষের অবস্থার বর্ণনা তুলে ধরছি। উদাহরণত, যদি আমরা কোনো সুখী মানুষের বর্ণনা দিতে চাই, তাহলে কীভাবে দেবো? হয়তো বলব, হাস্যোজ্জ্বল, প্রফুল্ল হৃদয়ের ও উদ্যমী। আপনি তার সাথে কথা বললে দেখবেন, তার কণ্ঠের স্বরে তার সুখের আভাস পাওয়া যায়। এ ছাড়া আনুষঙ্গিক আরও অনেক আলামত আছে।

অন্যদিকে যদি আমরা অসুখী মানুষের বর্ণনা দিতে যাই, তাহলে বলব, চেহারায় দুশ্চিন্তার ছাপ, মাথা নিচু করে থাকে, কণ্ঠস্বরেও দুঃখের আভাস পাওয়া যায় ইত্যাদি।

যদি আপনি এক দল মানুষের দিকে পর্যবেক্ষণের চোখে তাকান আর আমি আপনাকে বলি যে, বলুন, তাদের মধ্যে কে সুখী, কে অসুখী, কে উদ্যমী, কে অলস? আপনি বলবেন, এ লোকটা সুখী, ওই লোকটা অসুখী, এ লোকটা উদ্যমী, ওই লোকটা অলস। আপনি তাদের সাথে কথা না বলে স্রেফ তাদের দেখেই বলে দিতে পারবেন তাদের সঠিক অবস্থা।

এ থেকে বোঝা যায়, মানুষের বাহ্যিক অবস্থা তার ভেতরের অবস্থার জানান দেয়। যদি আপনি সুখী হন, তার ছাপ পড়বে আপনার বাহ্যিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গে। আপনি যদি ভীত হন, তাহলে তা আপনার বাহ্যিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গে প্রকাশ পাবে। এটা আমরা সবাই জানি এবং বুঝি।

একইভাবে সাইকোলজিস্টরা বলেন, এর উল্টোটাও সঠিক। অর্থাৎ আপনি যদি আপনার বাহ্যিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে পরিবর্তন করেন, তাহলে সেটার প্রভাব আপনার অভ্যন্তরীণ অনুভূতির ওপর পড়বে। আপনার বাহ্যিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিবর্তন আপনার ভেতরে প্রতিফলিত হবে। আপনি যদি উদ্বিগ্নতা অনুভব করেন, তাহলে সম্ভবত আপনার শরীরের বাহ্যিক পরিবর্তনের কারণেই এ দুশ্চিন্তা নামক অনুভূতি আপনার মনের মধ্যে ছড়িয়ে গেছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, অভ্যন্তরীণ অনুভূতি বাহ্যিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ওপর প্রভাব ফেলবে নাকি বাহ্যিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অবস্থা অভ্যন্তরীণ অনুভূতির ওপর প্রভাব ফেলবে? এক কথায় উত্তর হচ্ছে, বিষয়টা আপেক্ষিক।

আপনার দাঁড়ানো বা বসার ভঙ্গি ঠিক করা, চেহারার অবস্থা পরিবর্তন করা, কণ্ঠস্বর ঠিক করে নেওয়ার একটা বিরাট প্রভাব পড়ে আপনার মন ও মস্তিষ্কের ওপর। তাই অনেক প্রেসিডেন্ট ও যারা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন থাকেন, যাদেরকে জনগণের সামনে কথা বলতে হয়, তারা নিজেদের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ যথার্থ করার জন্য বিবিধ অনুশীলন করে থাকেন। কারণ এটা তাদের ইতিবাচকতা প্রকাশ করতে, আত্মবিশ্বাসী দেখাতে, কখনো কখনো তাদের কথায় জোর আনতে সাহায্য করে।

কথিত আছে, উমর বিন খাত্তাব ﵁ এক লোককে কুঁজো হয়ে হাঁটতে দেখলেন। লোকটা দুনিয়াবিমুখতা ও তাকওয়ার প্রকাশ করছিলেন তার এমন হাঁটার মাধ্যমে। উমর ﵁ তাঁর সঙ্গীদের বললেন, 'এ লোকটার কী হয়েছে? এমন করে হাঁটছে কেন? শরীরকে এভাবে বাঁকা করে মৃতের মতো হাঁটাই কি পরহেজগারি!'

এরপর তিনি লোকটার উদ্দেশে বললেন, 'শোনো, তুমি আমাদের দ্বীনকে মৃতের মতো প্রদর্শন করছ, আল্লাহ তোমাকে বুঝ দিন। ঠিক করে হাঁটো আর ইসলামের গৌরব প্রদর্শন করো।'

এরপর তিনি তাঁর সঙ্গীদের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে বললেন, 'এ লোকদের কী হলো, এরা দুনিয়াবিমুখতাকে দুর্বলতা ধরে নিয়েছে, ধার্মিকতাকে মৃতের মতো ভান ধরা মনে করছে! এরা কথা বলার সময় স্বরকে একেবারে নিচু করে ফেলে, হাঁটার সময় শরীরের কাঠামো নুইয়ে ফেলে!'

আল-ফারুক উমর বিন খাত্তাব ﵁ জানতেন, শরীরের বাহ্যিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অবস্থা মনের ভেতরের অনুভূতির ওপর প্রভাব ফেলে। তাই তিনি সে লোকটাকে বললেন, 'তোমার হাঁটার ধরন ঠিক করো। আর ইসলামের গৌরব প্রদর্শন করো।'

একইভাবে আমরা যদি খুশুময় সালাত আদায়কারীর বর্ণনা দিতে যাই, তাহলে তখন কী বলে তার বর্ণনা দেবো? কেমন হবে সে? খুশুময় সালাত আদায়কারী কি স্থিরতাসম্পন্ন হবে না? সালাতে তার নড়াছড়া কি গাম্ভীর্যপূর্ণ ধীরস্থির হবে না? তার কুরআনের তিলাওয়াত দ্রুত হওয়ার বদলে কি প্রশান্তিকর তিলাওয়াত হবে না? তার রুকু কি দীর্ঘ হবে না? তার দাঁড়ানোর সময়টা কি দীর্ঘ হবে না? তার সিজদা কি দীর্ঘ হবে না? অন্যদের চেয়ে কি তাকে আমরা দুই সিজদার মাঝে বেশি মগ্নতায় ডুবে যেতে দেখব না?

এভাবে খুশুর বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারি আমরা। আমরা চাইলে এসব বৈশিষ্ট্য আমাদের সালাতে বাস্তবায়ন করতে পারি। যখন আমাদের সালাতের বাহ্যিক অবস্থা এ রকম হবে, তখন আমাদের ভেতরের অবস্থাও সায় দেবে এবং আমরা সালাত আদায় করে প্রশান্তিতে ভরপুর হব।

যেভাবে খুশু আসবে

সালাতে খুশু আনতে হলে সালাতের প্রতিটি কাজ, প্রতিটি বাক্যকে অনুভব করতে হবে। তাকবিরে তাহরিমা বলার সময় ধীরস্থিরতার সাথে হাত ওঠাব, 'আল্লাহু আকবার' বলার সময় এটাকে পুরোপুরি অনুভব করব। এরপর যথাসাধ্য ধীরস্থিরতার সাথে কিরাআত পড়ব। প্রতিটি আয়াতের মাঝখানে যথার্থ বিরতি নেব, সময় নেব। আমরা সালাতে আছি, মুখস্থ করা পড়া শোনাতে আসিনি যে, যত দ্রুত পড়া শোনাব, তত ভালো নম্বর পাব, তত বেশি সুনাম হবে।

আপনি যে গতিতে সালাতে সুরা ফাতিহা পড়েন, সে গতিতে যদি মানুষের সাথে কথা বলতেন, তাহলে আপনার কথা বুঝতে তাদের রীতিমতো বেগ পেতে হতো। এবার চিন্তা করে দেখুন, আপনি সালাতে সকল বাদশাহর বাদশাহর সাথে কথোপকথনে আছেন, তাঁর সাথে যেমন গতিতে, যেমন ধীরস্থিরতার সাথে কথা বলতে হবে, সেভাবে কিরাআত পড়ুন।

যেমনটা আল্লাহর রাসুল ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে, 'আল্লাহ তাআলা বলেন, "আমি সালাতকে আমার ও আমার বান্দার মাঝে দুই ভাগে ভাগ করেছি। এক ভাগ বান্দার, আরেক ভাগ আমার।

বান্দা যখন বলে, "সকল প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই জন্য।"

আল্লাহ তখন বলেন, "আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে।"

বান্দা যখন বলে, "যিনি পরম করুণাময় অতি দয়ালু।"

আল্লাহ তখন বলেন, "আমার বান্দা আমার স্তুতি গাইছে।"

বান্দা যখন বলে, "যিনি বিচার দিনের মালিক।"

আল্লাহ তখন বলেন, "আমার বান্দা আমার মর্যাদার কথা বলছে।" (আবার কখনো বলেন, "বান্দা নিজেকে আমার কাছে সমর্পণ করছে।")

বান্দা যখন বলে, "আমরা কেবল আপনারই ইবাদত করি এবং আপনার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি।"

আল্লাহ তখন বলেন, "এটা আমার ও আমার বান্দার মধ্যকার বিষয়। আর আমার বান্দা যা চায়, সে তা-ই পাবে।"

যখন বান্দা বলে, "আমাদেরকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করুন। তাদের পথ প্রদর্শন করুন, যাদের প্রতি আপনি অনুগ্রহ করেছেন। তাদের পথ নয়, যারা অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট।"

আল্লাহ বলেন, "এটা আমার বান্দার জন্য। আমার বান্দা যা চায়, তার জন্য তা রয়েছে।'"[২৬]

আপনি জানেন কি?

নবিজি ﷺ তাকবিরে তাহরিমা বলার পর সালাত শুরু করতেন এ দুআটি পড়ে :

> اللهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ
>
> 'হে আল্লাহ, আমার ও আমার গুনাহর মাঝে এতটা দূরত্ব সৃষ্টি করে দিন, যতটা দূরত্ব রয়েছে পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে। হে আল্লাহ, আমাকে আমার গুনাহ থেকে এমনভাবে পাক-সাফ করে দিন, যেমনটা সাদা কাপড়কে ময়লা থেকে পরিষ্কার করা হয়। হে আল্লাহ, আমাকে আমার গুনাহ থেকে পানি, বরফ ও তুষার দিয়ে পরিষ্কার করে দিন।'[২৭]

এরপর যখন আপনি কিরাআত পড়া শেষে সালাতের পরবর্তী কার্যক্রমের দিকে যাবেন, তখন ধীরস্থিরভাবে এগিয়ে যান। ধীরস্থিরতা আপনাকে আপনার সালাত খুশুময় করতে সাহায্য করবে।

রুকু দীর্ঘ করুন। রুকুর মধ্যে মগ্ন হয়ে ডুবে যান আল্লাহর প্রশংসায়। সুন্দর করে রুকুর তাসবিহ আদায় করুন। سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ (পবিত্রতা বর্ণনা করছি

---

২৬. সহিহু মুসলিম : ৩৯৫।
২৭. সহিহুল বুখারি : ৭৪৪, সহিহু মুসলিম : ৫৯৮। হাদিসের শব্দউৎস মুসলিমের।

আমার মহান রবের)। রুকুতে এ তাসবিহ তিনবার, পাঁচবার পড়তে পারেন। তবে আপনার পড়াটা যেন স্পষ্ট, শান্ত ও ধীরস্থির হয়।

তেমনই রুকু থেকে ওঠার পর দাঁড়ানো অবস্থায় সুন্দর করে দাঁড়ান আর কিছুটা সময় অপেক্ষা করুন। রুকু থেকে উঠে আপনার শরীর স্থির ও শান্ত হলে বলুন : رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ (আমাদের রব, সকল প্রশংসা আপনার)।

আপনি জানেন কি? নবিজি ﷺ রুকুতে গিয়ে তাসবিহ আদায়ের পর আরও পড়তেন :

سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ

'ফেরেশতাদের ও রুহের (জিবরাইলের) রব আল্লাহ মহামহিম এবং মহাপবিত্র সত্তা।'[২৮]

اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخِّي وَعَظْمِي وَعَصَبِي

'হে আল্লাহ, আপনার উদ্দেশে আমার এ রুকু। আপনার প্রতি ইমান আনছি। আপনার কাছে নিজেকে সমর্পণ করছি। আমার কান, চোখ, মগজ, হাড় ও স্নায়ু আপনার কাছে নত হলো।'[২৯]

আপনি জানেন কি? নবিজি ﷺ রুকু থেকে ওঠার সময় পড়তেন :

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ

'হে আমাদের রব, আপনার জন্য অগণিত সুন্দর, উত্তম ও বরকতময় প্রশংসা।'[৩০]

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ

২৮. সহিহ মুসলিম : ৪৮৭।
২৯. সহিহ মুসলিম : ৭৭১।
৩০. সহিহুল বুখারি : ৭৯৯।

'হে আমাদের রব, আপনার জন্যই প্রশংসা আসমান ও জমিনের সমপরিমাণ, উভয়ের মধ্যবর্তী জায়গা পরিমাণ এবং তারপর আপনি যা চান তার বরাবর।'[৩১]

একইভাবে সিজদার সময়ও যেন আপনার নড়াচড়া শান্ত ও ধীরস্থির হয়। সিজদা দীর্ঘ করুন। সিজদার মাঝে ডুবে যান। সিজদার তাসবিহ আদায় করুন স্পষ্ট করে, শান্ত ও ধীরস্থিরভাবে :

سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى

'সর্বোচ্চ মহিমান্বিত আমার রবের পবিত্রতা বর্ণনা করছি।'[৩২]

মনে রাখুন, বান্দা তার রবের সবচেয়ে নিকটবর্তী হয় সিজদার সময়টাতে। তাই তাসবিহ ও দুআর মাধ্যমে আল্লাহর সাথে কথা বলুন শান্ত হয়ে ও ধীরস্থিরতার সাথে। কারণ আপনি এখন সিজদার মধ্যে আছেন; আপনি এখন সেই মহান সত্তার সবচেয়ে নিকটবর্তী, যিনি আসমানসমূহ ও জমিনের মালিক। এটাই আপনার জন্য সুবর্ণ সুযাগ। যা ইচ্ছে চেয়ে নিন। মহান দাতার কাছে আপনার সব চাওয়া না বলা পর্যন্ত সিজদা থেকে মাথা তুলবেন না যেন।[৩৩]

আপনি জানেন কি? নবিজি ﷺ সিজদায় তাসবিহ পড়ার পর আরও পড়তেন :

سُبْحَانَكَ اللهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللهُمَّ اغْفِرْ لِي

'হে আল্লাহ, আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। হে আমাদের রব, আপনার জন্য সকল প্রশংসা। হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা করে দিন।'[৩৪]

---

৩১. সুনানু আবি দাউদ : ৭৬০। হাদিসের মান : সহিহ।
৩২. সহিহ মুসলিম : ৭৭২।
৩৩. আহনাফের মতে, সালাতে দুনিয়াবি কোনো বিষয়ে দুআ করলে সালাত ভেঙে যাবে। যেমন : 'হে আল্লাহ, আমাকে একজন সুন্দরী নারীর সঙ্গে বিয়ে করিয়ে দাও, আমাকে একটি সুন্দর গাড়ি দাও, একটি সুন্দর ঘর দাও।' তাই কুরআন ও হাদিসে যেসব দুআ এসেছে, সালাতে সেসব দুআ করাই নিরাপদ।' (বিস্তারিত জানতে দেখুন, ফাতাওয়া হিন্দিয়া : ১/১০০, ফাতহুল কাদির : ১/৩১৯) অধিকাংশ হাম্বলি উলামা এই মতই পোষণ করেন। তবে মালিকি ও শাফিয়ি মাজহাবে সালাতে দুনিয়াবি বিষয়েও দুআ করা যায়। - অনুবাদক।
৩৪. সহিহুল বুখারি : ৭৯৪।

اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

'হে আল্লাহ, আমি আপনার উদ্দেশে সিজদা করছি, আপনার প্রতি ইমান আনছি, আপনার কাছে নিজেকে সমর্পণ করছি। আমার চেহারা তাঁকে সিজদা করছে, যিনি এ চেহারা সৃষ্টি করেছেন, তাকে আকৃতি দিয়েছেন, তাতে কান দিয়েছেন এবং চোখ দিয়েছেন। সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ কতই না মহান।'[৩৫]

নবিজি ﷺ সিজদাকে যতটা দীর্ঘ করতেন, দুই সিজদার মাঝখানের বসাকেও ততটা দীর্ঘ করতেন। তাই আপনার সালাতকে খুশুময় করতে শান্ত ও ধীরস্থির হয়ে যথাযথভাবে সিজদা আদায় করুন।

রাসুল ﷺ দুই সিজদার মাঝখানে যেভাবে দুআ করতেন, সেভাবে দুআটা করুন :

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِنِي، وَعَافِنِي، وَارْزُقْنِي

'হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা করুন, আমার প্রতি দয়া করুন, আমাকে হিদায়াত দিন, আমাকে সুস্থ করে দিন, আমাকে রিজিক দিন।'[৩৬]

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاجْبُرْنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي

'হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা করুন, আমার প্রতি দয়া করুন, অনুগ্রহ করুন, আমাকে হিদায়াত দিন, রিজিক দিন।'[৩৭]

এভাবে শান্ত হয়ে ও ধীরস্থিরভাবে সালাতের প্রতিটি কাজ আদায় করা ও কিরাআত পড়া সালাতকে খুশুময় করতে ও অন্তরের প্রশান্তি লাভ করতে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। আর অন্তরের প্রশান্তি তো সালাতের পাবন্দ হওয়ার অন্যতম সহায়ক। যাকে বলা যায় সালাতের অভ্যাস তৈরির টনিক।

---

৩৫. সহিহু মুসলিম : ৭৭১।
৩৬. সহিহু মুসলিম : ২৬৯৭।
৩৭. সুনানুত তিরমিজি : ২৮৪; হাদিসের মান : সহিহ।

শুরুতে শান্ত ও ধীরস্থিরতার সাথে সালাত আদায় করা কিছুটা কঠিন হতে পারে। কারণ এতদিন তো দ্রুত গতিতে ও দ্রুত কিরাআতে সালাত আদায় করতেন। কিন্তু যখনই নিজেকে সংযমী করে শান্তভাবে কিরাআত পড়বেন, ধীরস্থিরতার সাথে সালাত আদায় করবেন, তখনই আপনার সালাত খুশুময় হবে এবং এক সময় খুশুময় সালাত আপনার ব্যক্তিত্বের অংশে পরিণত হবে। আবার খুশুময় সালাতের প্রভাব আপনার দৈনন্দিন কাজের মধ্যেও দেখতে পাবেন। দ্রুত গতিতে ধাবমান চলমান অস্থির জগতে আপনি প্রশান্তি অনুভব করবেন।

কথোপকথন

ধরুন, আপনি বন্ধুর কাছে কল দিলেন। কিন্তু সে রিসিভ করল না। রিং বাজা শেষ হওয়ার পর একটা যান্ত্রিক কণ্ঠ শোনা গেল। কণ্ঠটা বলছে, 'আপনার ভয়েস রেকর্ড করুন।' বন্ধুর সাথে কথা হলো না। অগত্যা আপনি আপনার কথাগুলো বলতে শুরু করলেন। ভয়েস রেকর্ডের মাধ্যমে বন্ধুর সাথে এ যোগাযোগ আর তার সাথে সরাসরি কথা বলার অনুভূতি কি সমান হবে? অবশ্যই না। সরাসরি কথা বলতে পারলেই আপনি তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট হতেন বেশি।

আপনি যদি আপনার সালাতকে প্রাণবন্ত করতে চান, তাহলে সালাতের তাসবিহ ও কিরাআত এমনভাবে আদায় করবেন না, যেন আপনি ভয়েস রেকর্ড করে পাঠাচ্ছেন। বরং সালাতের প্রতিটি তাসবিহ, কিরাআতের প্রতিটি শব্দ এমন অনুভূতি নিয়ে উচ্চারণ করুন, যেন অপর পাশ থেকে একজন শুনছেন, তিনি আপনার প্রতিটি শব্দের উত্তর দিচ্ছেন। মহামহিম আল্লাহর সাথে আপনার এ কথোপকথন যেন ভয়েস রেকর্ডের মতো না হয়। বরং এ কথোপকথন যেন সরাসরি কথা বলার মতো হয়। তাই প্রতিটি শব্দ আপনার হৃদয়ের গভীর থেকে উচ্চারণ করুন।

এখন তো আল্লাহর সাথে কথোপকথনের অনেক সময় ও সুযোগ পাচ্ছেন। কিন্তু অচিরেই কিয়ামতের দিন আপনি অনেক আশায় বুক বেঁধে কামনা করবেন, যেন আল্লাহ তাআলা আপনার প্রতি অন্তত একটা শব্দ বলেন। সেদিনের পরিস্থিতি এমন হবে যে—

لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ وَقَالَ صَوَابًا

'(সেদিন) দয়াময় আল্লাহ যাকে অনুমতি দেবেন, সে ব্যতীত কেউ কথা বলতে পারবে না। আর সে সঠিক কথাই বলবে।'[৩৮]

وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا

'দয়াময়ের সম্মুখে সেদিন যাবতীয় আওয়াজ স্তব্ধ হয়ে যাবে, মৃদু গুঞ্জন ছাড়া তুমি কিছুই শুনবে না।'[৩৯]

যে ব্যক্তি দুনিয়ায় থাকতে মহান মালিক আল্লাহর সাথে সুন্দর করে কথা বলে না, আখিরাতে আল্লাহ তার দিকে ভ্রুক্ষেপও করবেন না।'

আল্লাহর সাথে কথোপকথনের আরেক নাম সালাত। তাই সালাতে মহান আল্লাহর সাথে সেভাবে কথা বলুন। আর এমনভাবে তাঁর মহিমা বর্ণনা করুন, যেন এটিই তাঁর সঙ্গে আপনার শেষ সাক্ষাৎ।

التحيات لله والصلوات والطيبات...

'সকল মহিমা, ইবাদত ও উত্তম প্রশংসাসমূহ আল্লাহর জন্য।'

ইবনু কাইয়িমিল জাওজিয়্যাহ ﷺ বলেন :

'যখন সালাত আদায় করবে, তখন মাবুদের জন্য যেমন উপযুক্ত তেমন যেন হয় সালাত। অন্যথা তোমার এলোমেলো সালাতের জন্য সে রকম কোনো মাবুদ খুঁজে নাও।'[৪০]

---

৩৮. সুরা আন-নাবা, ৭৮ : ৩৮।

৩৯. সুরা তহা, ২০ : ১০৮।

৪০. বাদায়িউল ফাওয়ায়িদ, ৩ : ২৩৩।

সকালবেলার পাখি

হাল এলরোড তার বিখ্যাত বই The Miracle Morning-এ চমৎকার আলোচনা এনেছেন। তার এ বইটি হাজারো মানুষের জীবন বদলে দিয়েছে। যে হতাশা ও বিষণ্নতা তাকে প্রায় আত্মহত্যা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছিল সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠার অভ্যাস সেখান থেকে তাকে কীভাবে মুক্ত করেছিল, সে কথাই তুলে ধরেছেন তিনি। হাল এলরোড সামাজিক জীবনে, কর্মজীবনে বেশ সফল ছিলেন। তার একটি বইও প্রকাশিত হয়েছিল। বইটা বেশ বিক্রিও হয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ করে ২০০৭'র অর্থনৈতিক বিপর্যয় তাকে সর্বহারা করে ছাড়ে। একদিকে কাজ নেই। অন্যদিকে ঋণের তলে ডুবে আছেন। এমনকি বাড়ির আনুষঙ্গিক বিলও চুকাতে পারছিলেন না। এমন করুণ অবস্থা তাকে হতাশা ও বিষণ্নতার শেষ প্রান্তে নিয়ে যায়।

তখন হাল এলরোড তার অধিকাংশ সময় ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিতেন। কারণ ঘুম থেকে জাগার কোনো বিশেষ কারণ ছিল না তার কাছে। ঘুম থেকে উঠলে তো তাকে অর্থহীন জীবনের মুখোমুখি হতে হবে, তাই ঘুম থেকে জাগার প্রতি কোনো আগ্রহ ছিল না তার। অধিকাংশ বিষণ্নতায় ভোগা রোগীর অবস্থা এ রকমই হয়ে থাকে।

অবশেষে এক কাছের বন্ধু তাকে বলল, তার ব্যায়াম শুরু করা উচিত। তাহলে সে তার এ বিষণ্নতার অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে। তার বন্ধু উপদেশ দিল, বিশেষ করে যেন সে জগিং করে। এটা তাকে অন্যরকম অনুভূতি দেবে।

হাল এলরোড তার বন্ধুকে বলল, জীবনে কখনো জগিং করেননি তিনি। আসল কথা হচ্ছে জগিং করা কখনোই পছন্দ করতেন না তিনি। কিন্তু এরপর তিনি ভেবে দেখলেন, জীবনটাও তো তার কাছে অর্থহীন হয়ে উঠেছে। এ জীবনটাও তো তার পছন্দ না। তাহলে কিছু দিন জগিং করলে ক্ষতি কী! তাই এক ছুটির দিন দুপুরবেলা ব্যায়ামের পোশাক পরে তার বাড়ির পাশের জায়গাটায় দৌড়ানো শুরু করলেন।

এটা তার জন্য বেশ উপকারী ছিল। নতুন কিছুর অভিজ্ঞতা পেলেন তিনি। ব্যায়ামের সময়টাতে যেন তার মস্তিষ্কে ঘুরঘুর করতে থাকা দুশ্চিন্তাগুলো উবে গেছে। তিনি অনুভব করলেন, কিছু সময়ের জন্য তার মাথা একদম পরিষ্কার হয়ে গেছে। যা তাকে জীবনের সমস্যাগুলোর সমাধানে ইতিবাচক ভাবনা শুরু করতে সাহায্য করেছে।

এ রকম মুহূর্তগুলো হাল এলরোডের ভীষণ পছন্দ হয়। তাই তিনি নিয়মিত জগিং করার সংকল্প করলেন। কিন্তু এ সংকল্পটা তেমনই ছিল, যেমনই এর আগে জীবন সুন্দর করার জন্য আরও অনেক কাজ করার সংকল্প করেছিলেন তিনি। কিন্তু সময় পাওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছিল বিধায় জীবনকে সুন্দর করার সেসব কাজ তিনি শুরু করতে পারেননি কখনো। জীবন সুন্দর করার জন্য সময় না পাওয়ার স্তরে আটকে ছিলেন তিনি।

এখানে লেখক ম্যাথিউ কেলির একটি উক্তি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। ম্যাথিউ বলেন, 'আমরা সকলেই জীবনকে সুন্দর করতে চাই। জীবনকে সুন্দর করতে প্রয়োজনীয় করণীয় সম্পর্কে আমরা অবগত হলেও সেসব করণীয় কাজ করছি না আমরা। কারণ আমরা ব্যস্ত। সুখী না হওয়ার মাঝেই আমরা ব্যস্ত, তাই সুখ অধরাই থেকে যায়।'

হাল এলরোডের সকালে ঘুম থেকে জাগার অভ্যাস ছিল না। যেমনটা এ পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষেরই এ অভ্যাস নেই। তবে সবাই জরুরি কাজ পড়লে ভোরবেলা ঘুম থেকে জাগতে পারে। যেমন ভোরবেলা কাজে যাওয়ার দরকার হলে বা সরকারী কোনো কাজে কিংবা সময়মতো ফ্লাইট ধরা ইত্যাদি।

এলরোড নিজেকে নিশাচরদের একজন মনে করতেন। তাই অফিসের কাজ

থেকে ফেরার পর রাতের বেলায় জগিং ও জীবন বদলানোর পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়ন করতে চাইলেন। কিন্তু তিনি দেখলেন রাতের সময়টা এগুলো করার জন্য যথার্থ সময় নয়। কারণ সারা দিনের কাজ শেষে রাতে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েন। এসব করার জন্য যথেষ্ট মানসিক ও শারীরিক সক্ষমতা থাকে না তার।

এবার তিনি চিন্তা করলেন, দিনের কাজের ফাঁকে বিরতির সময়টাকে কাজে লাগানো যাক। কিন্তু এখানেও তেমন সুযোগ কই! কাজের ফাঁকে ব্যায়াম প্রভৃতি করার মতো উপযুক্ত সময় পাওয়া গেলেও তা বিরল। আবার তখন বিভিন্ন চিন্তাভাবনা ঘিরে রাখে তাকে। চিন্তাভাবনা এলে সে মোতাবেক তাকে কাজে মনোযোগও দিতে হয়। তার কাজের বিরতির সময়টা এভাবেই কাটে।

এরপর হাল এলরোড দেখলেন ভোরবেলায় অফিসে যাওয়ার আগের সময়টাই তার জন্য যথার্থ সময়। কিন্তু ভোরবেলা ঘুম থেকে ওঠা তার জন্য দুঃস্বপ্নের মতো ছিল। কোনো রকম জরুরি উপলক্ষ ছাড়া ভোর চারটা কি পাঁচটায় ওঠা তার জন্য কল্পনাতীত।

কাজে যাওয়ার জন্য তিনি বহু কষ্টে সকাল ছয়টায় উঠতে পারতেন। কখনো কখনো সেটা সাতটা পর্যন্ত গড়িয়ে যেত। এ রকম দিনগুলোতে তিনি একরকম মহাযুদ্ধ করে তবেই বিছানা ছাড়তে পারতেন। তাই কিছুদিন তিনি সকালে উঠে ব্যায়াম করার চিন্তাটা একেবারে ভুলে যেতে চাইলেন আর জীবনটা যেমন আছে, তেমনই কাটিয়ে দিতে চাইলেন। কিন্তু তখন তিনি লেখক কেবিন ব্রেসির একটা উক্তি স্মরণ করলেন :

'তুমি যদি তোমার যাপিত জীবনের চাইতে উন্নত জীবন চাও, তাহলে যেমন কাজকর্ম তুমি করছ, সেসব বদলে আরও উন্নত কিছু করতে হবে তোমাকে।'

মহান প্রভুর রীতি এমনই। মর্যাদাদানকারী ও লাঞ্ছিতকারী তিনিই। আল্লাহ তাআলা বলেন :

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

'আল্লাহ ততক্ষণ কোনো সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেরাই নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে।'[৪১]

অতএব, যদি আপনার জীবন সুখী না হয়, আপনি যদি সুখী ও প্রশান্তির জীবন পেতে চান, তাহলে অবশ্যই আপনাকে আপনার জীবনযাপনের পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনতে হবে, তাহলে আল্লাহ আপনার জীবন বদলে দেবেন। অন্যদিকে যদি আপনার জীবন সুখের হয়, তাহলে সব দিক যত্নসহকারে সংরক্ষণ করুন, তাহলে আল্লাহ তাআলা আপনাকে দেওয়া নিয়ামত পরিবর্তন করবেন না। এ বিষয়টা তুলে ধরতে গিয়ে ড. রাতিব নাবলুসি বলেন :

'নিজেকে বদলে নাও, যেন বদলে যায় জীবন। নিজেকে বদলাতে না পারলে, কোনো কিছুই বদলাবে না।'

দ্য মিরাকল মর্নিং

হাল এলরোড তার জীবনকে নতুন মাত্রা দিতে ছয়টা কাজ লিখে নিলেন। দৃঢ়সংকল্প হলেন যে, সকাল পাঁচটায় তিনি উঠবেনই। আর প্রতিটি কাজে ১০ মিনিট করে সময় দেবেন। এরপর অফিসের জন্য বেরিয়ে পড়বেন। এ ছয়টা কাজের কয়েকটি হলো : প্রার্থনা করা, বই পড়া ও ব্যায়াম।

মজার কথা হচ্ছে, তিনি যখন এ কাজগুলো একটা কাগজে লিখে ফেললেন, তখন তার লেখাটাই তাকে পরবর্তী দিন সকালে উঠে পড়তে সাহায্য করেছে প্রচণ্ড রকমের উৎসাহ দিয়ে। অথচ এত সকালে ঘুম থেকে ওঠার চিন্তা করাটাও তার জন্য কল্পনাতীত ছিল।

এ বিষয়ে সাইকোলজি বিজ্ঞান আমাদের বলে, পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, যারা তাদের লক্ষ্যগুলো কাগজ প্রভৃতিতে লিখে নেয়, সেসব লক্ষ্য পূরণে তারা অন্যদের চাইতে ৮০% বেশি সফল হয়। আবার যারা তাদের সমস্যাগুলো ও সমস্যার সম্ভাব্য সমাধানগুলো লিখে নেয়, তারা সেসব সমস্যা নিয়ে বেশি দুশ্চিন্তা করা থেকে নিজেদের মুক্ত রাখতে পারে।

---

৪১. সুরা আর-রাদ, ১৩ : ১১।

গল্পে ফিরে যাই। পরবর্তী দিন হাল এলরোড সকাল পাঁচটায় ঘুম থেকে উঠলেন। যদিও যথেষ্ট পরিমাণ ঘুম তার হয়নি, তবুও জাগতে সমস্যা হয়নি তার। ভোর পাঁচটায় ঘুম ছেড়ে উঠে পরিকল্পনা বাস্তবায়নে লেগে গেলেন তিনি। প্রতিটি কাজের জন্য যে মাত্র ১০ মিনিট বরাদ্দ ছিল, সে মোতাবেক কাজ করতে লাগলেন। এসব কাজ করতে গিয়ে তিনি তেমন কাঠিন্য বা প্রতিকূলতা অনুভব করলেন না। কারণ আপনি যদি ১০ মিনিট বই পড়ার দৃঢ় সংকল্প করেন, তাহলে আপনার নফস আপনাকে বাধা দেবে না। তেমনই যদি সময় বাড়িয়ে আপনি এক ঘণ্টা বা দুই ঘণ্টা পড়ারও দৃঢ় সংকল্প করেন, তবুও আপনার নফস বাধা দেবে না। কারণ আপনার দৃঢ় সংকল্পের সাথে লড়তে আসবে না সে।

হাল এলরোড তার সকালের রুটিনটাকে যথার্থরূপে পালন করতে থাকলেন কয়েক সপ্তাহ ধরে। এবং তিনি জীবনে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখতে পেলেন। তার দুশ্চিন্তা-উদ্বেগ ধীরে ধীরে বিদায় নিতে লাগল। তিনি নিজের সমস্যাগুলোর সমাধান করতে ও জীবনকে আরও সমৃদ্ধ করার কাজে মনোযোগ দিতে পারলেন আরও বেশি করে। এরপর তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, প্রতিটি কাজে আরও বেশি করে সময় দিতে এবার থেকে ভোর চারটায় ঘুম থেকে জাগবেন। বাস্তবিকই ভোর চারটায় ঘুম থেকে জাগা তার অভ্যাসে পরিণত হলো এবং অনায়াসে তিনি প্রতিদিন ভোর চারটায় জেগে উঠতেন।

দুই মাসের মধ্যে হাল এলরোডের জীবন পরিবর্তন হয়ে গেল বৈপ্লবিকভাবে। তিনি এ জীবন পরিবর্তনকে একটা নাম দিতে চাইলেন আর নিজের আত্মোন্নয়ন হাজারো মানুষের সাথে ভাগ করে নিতে চাইলেন। তিনি এর নাম দিলেন 'দি মিরাকল মর্নিং' বা অলৌকিক সকাল।

নিজের জীবনের গল্প শুনানোর জন্য হাল এলরোড যে সেমিনারগুলোর আয়োজন করতেন, তার নামও হয়ে গেল 'দ্য মিরাকল মর্নিং'। মিলিয়ন মিলিয়ন বিক্রি হওয়া তার বইটির নামও দেওয়া হলো 'দ্য মিরাকল মর্নিং'। ১৭টি ভাষায় অনূদিত হয়েছে এ বইটি। তিনি একটা অফিসিয়াল ওয়েবসাইট তৈরি করলেন। হাজার হাজার মানুষ সেখানে দ্য মিরাকল মর্নিং'র সাথে তাদের জীবন পরিবর্তনের কথা তুলে ধরলেন। প্রতিদিন কয়েক দশক মানুষ তাদের

গল্প বর্ণনা করছে এ ওয়েবসাইটে এসে। সকালে ওঠার অভ্যাসের মাধ্যমে তাদের জীবনে কতটা উন্নতি হয়েছে তার আখ্যান তুলে ধরেছে।

ব্যক্তিগতভাবে আমিও নিজের গল্প নিয়ে উপস্থিত হলাম সেখানে। আমার গল্পটা তো 'দ্য মিরাকল মর্নিং' বইটি পড়ার আগে থেকেই শুরু হয়ে গেছে। তাই আমি গর্ব ভরে হালকে জানালাম যে, আমি এমনিতেই প্রতিদিন ভোর চারটায় উঠে পড়ি। কারণ আমার দ্বীন আমার ওপর এটা আবশ্যক করে দিয়েছে। ঘুম থেকে ওঠার পর আমি যেটা করি, সেটা হচ্ছে আমি সালাত আদায় করি। আর এ সালাতকে আমি নাম দিয়েছি 'দ্য মিরাকল সালাত' নামে।

দ্য মিরাকল সালাত

ফজরের সালাত...

এ সালাত ধরি ধরি করে অনেক বছর কাটিয়ে দিলাম। কিন্তু ফজরের সালাতে নিয়মিত হওয়ার সৌভাগ্য জুটলো না আমার। আমার অবস্থা তখন এমন হয়ে দাঁড়াল যে, যখনই এ নিয়ে চিন্তা ওঠে, তখনই আমার অন্তর সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। দুশ্চিন্তায় মন ছেয়ে যায় যে, হয়তো হাতে গোনা কয়েক ওয়াক্ত সালাতের আমল নিয়েই এ দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হবে আমাকে। সালাত আদায় করি না বলে, মনে হতে লাগল, জীবনে কী যেন নেই। অপূর্ণ লাগছিল জীবনটা। কিয়ামতের দিন রবের সামনে দাঁড়িয়ে ফজরবিহীন আমলনামা দেখে আমার কী অবস্থা হবে! বিষয়টা নিয়ে চিন্তা করি আর বারবার আঁতকে উঠি।

যে রব আমাকে সবকিছু দিলেন, আমি তাঁকে কী জবাব দেবো? কেন ফজর পড়িনি আমি? আমি কী উত্তর দেবো? আমার সব অজুহাতই তো মহান আল্লাহর প্রদত্ত নিয়ামতের সামনে তুচ্ছ।

ফজরের সালাত ঠিকমতো আদায় করার জন্য অনেক পথ অবলম্বন করলাম। কিন্তু ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছুই হাতে এল না। একটা সময় পর্যন্ত জীবনের অগোছালো অবস্থাকে, যুগের অগোছালো পরিস্থিতিকে দুষতে থাকলাম। এরপর একদিন আবিষ্কার করলাম, আমি ও আমার মতো যারা বাকি চার ওয়াক্ত সালাত পড়তে পারে, কিন্তু ফজর পড়তে পারে না, আমরা মূলত

ফজরের সালাতকে আমাদের লাইফ স্টাইলের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে চাই, কিন্তু ফজরের সালাতের জন্য নিজেদের লাইফ স্টাইলে কোনো পরিবর্তনই আনতে চাই না আমরা!

আমি আবিষ্কার করলাম, আমরা ফজরের সালাতের জন্য জাগতে না পারার অক্ষমতাকে দ্বীনি ও রুহানি শক্তির অপ্রতুলতার অজুহাতে ঢাকতে চাই। অথচ বাস্তবতা হচ্ছে, একটা সামান্য যৌক্তিক কারণ এড়িয়ে যাচ্ছি আমরা, যেটা ঠিক করে নিলেই সব ল্যাঠা চুকে যায়। আর সেটা হচ্ছে, তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়া। নিজেদের দ্বীনি ও রুহানি শক্তির অপ্রতুলতা খুঁজতে যাওয়ার আগে এ পরিকল্পনাটি বাস্তবায়ন করতে হবে আমাদের।

আশ্চর্য! আমরা মধ্যরাতে ১২টার দিকে অথবা আরও দেরি করে একটার দিকে ঘুমোতে যাই আবার সে ক্লান্ত শরীর নিয়ে ভোর চারটা/পাঁচটায় ওঠার পরিকল্পনাও করি! দেরিতে ঘুমোতে যাওয়ার অর্থ শয়তানের জন্য একটা বিরাট সুযোগ তৈরি করে দেওয়া। দেরিতে ঘুমিয়ে যখন আমরা ফজরের সালাতের জন্য জাগতে চাইব, তখন শয়তান এসে আমাদের বোঝাবে, 'এখনো যথেষ্ট ঘুম হয়নি... ঘুমাও... ঘুমাও।'

অন্যদিকে ভেবে দেখুন, যদি আপনি ঠিক সময়ে ঘুমিয়ে ছয় ঘণ্টার ঘুম পূর্ণ করেন, তাহলে সহজেই ফজরের সময় উঠতে পারবেন। শয়তানের দেওয়া ওই অজুহাতটা তখন আর ধোপে টিকবে না। কিন্তু যদি আপনি দুই ঘণ্টার ঘুম দিয়ে ফজরের জন্য ওঠার পরিকল্পনা করেন, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আপনার আশাটা দুরাশায় পর্যবসিত হতে বাধ্য।

মহাপ্রজ্ঞাবান আল্লাহর প্রজ্ঞা নিহিত রয়েছে ফজরের সালাতের মধ্যে। আল্লাহ চান, ফজরের সালাতই যেন আপনার লাইফ স্টাইলে পরিণত হয়। আল্লাহর প্রজ্ঞা এর মধ্যে নিহিত যে, ফজরের সালাত আপনার পুরো দিনের কেন্দ্রীয় শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হবে। পুরো দিনটা বেশ কর্মদক্ষতায় কাটবে।

ফজরের সালাত এমন কোনো স্টেশন নয় যে, আপনার সফরের মধ্যে ছোট্ট একটা স্টেশন এল, আপনি সেখানে নামলেন প্রাকৃতিক প্রয়োজন সেরে আবার সফর অব্যাহত রাখলেন। অন্যদিকে যখন ঘুম থেকে উঠতে পারলেন না, এ

স্টেশনটাতে নামতে পারলেন না, আপনার কিছুই এল গেল না।

আল্লাহ চান, আমরা যেন ফজরের সালাতকে আমাদের লাইফ স্টাইল বানাই, ফজরের সালাতকে ঘিরে যেন আমাদের জীবনপ্রবাহ নির্ধারণ করি। এর অন্যথা নয়। মহাপ্রজ্ঞাবান সৃষ্টিকর্তা আমাদের কাছে এমনটাই চান, এটাই তাঁর নিয়ম। তিনি যেভাবে চান, সেভাবেই করতে হবে আমাদের। যে ব্যক্তি মহান স্রষ্টার নিয়মমাফিক চলবে—এমনকি কোনো অমুসলিমও (পার্থিব জীবনে)—সফলতা তার সঙ্গী হবে। কারণ এটাই আল্লাহর নির্ধারিত নিয়ম।

আমি নিজের অবস্থার দিকে তাকালাম। নিজের লাইফ স্টাইল নিয়ে ভাবলাম। যে সালাত আদায় করলে ফেরেশতাগণ আল্লাহর কাছে আমার জন্য সাক্ষ্য দেয়, যে সালাত আদায় করলে আমি আল্লাহর জিম্মায় থেকে দিন শুরু করি, যে দুই রাকআত সুন্নাত সালাত দুনিয়া ও দুনিয়ার সকল কিছু থেকে উত্তম, যে সালাতের সাথে আমার দুনিয়া ও আখিরাতের লক্ষ্য অর্জনের সুযোগ জড়িত, যে সালাত আদায়ের মাধ্যমে আমি সর্বদা যে রকম জীবন চেয়েছিলাম, সে রকম জীবন পেতে পারি—সে সালাতের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ আর কিছু দেখলাম না।

আপনি রাত দশটার পর কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করেন আমাকে বলুন। অধিকাংশ লোকেরই রাত দশটার পর কোনো জরুরি কাজ থাকে না। তবে যারা নাইট-ডিউটি করেন তাদের কথা ভিন্ন। যদি রাত দশটার পর করার মতো কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ থাকেও, তবুও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সে কাজটা সকালে করলেও চলে। তাই রাত দশটার পর জেগে থাকার কোনো মানে হয় না।

অনেকে আমার কাছে একটা সমস্যার কথা বলে যে, তারা কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে চান, তাদের লিস্টে কিছু কাজ আছে, কিন্তু করার মতো সময় পায় না। আমি আমার সেসব বন্ধুকে উপদেশ দিই যে, আপনারা ফজরের সময় উঠে পড়ুন। দেখবেন অনায়াসে সেসব কাজ করার জন্য ঢের সময় পেয়ে যাচ্ছেন। ফজরের সময় উঠে দিনের আরম্ভটা করুন, তাহলে আপনার সামনে থেকে আপনার দিনের একটা বরকতময় অংশ চুরি হবে না আর। জীবন হবে

বরকতময়। ২৪ ঘণ্টার জীবন আরও কয়েক ঘণ্টা বেড়ে যাবে।

কিন্তু আমি কিছু মানুষের কাজকর্ম একদম বুঝে উঠতে পারি না যে, তারা চায়টা কী! তারা ফজরের মধ্য দিয়ে নিজেদের দিন শুরু করতে চায় না। তারা চায় ফজরের সালাত তাদের ঘুমের সফরের একটা স্টেশনের মতোই থাকুক। হয়তো ফজরের সময়টার সাথে তাদের অপ্রিয় কোনো স্মৃতি আছে। যেমন পরীক্ষার জন্য ওঠা অথবা কোথাও সফরে যাওয়ার জন্য জাগার চাপ, এমন কিছু ঘটনা তাদের মাঝে দুশ্চিন্তার সঞ্চার করেছে। তাই সব সময় তারা ফজরের জাগ্রত হওয়ার সাথে এসব খারাপ স্মৃতিকে যুক্ত করে রাখে। ফলে ফজরের জন্য উঠতে তাদের মন সায় দেয় না। আবার তারা ফজরের জন্য ও জীবনের সফলতার জন্য রাতের দুই-তিন ঘণ্টা বিসর্জন দিতেও চায় না। এভাবে চলতে গেলে ফজরও হবে না, সফলতাও ধরা দেবে না।

আপনার কোনো লক্ষ্য আছে কি?

হয়তো একঘেয়ে রুটিনে বাঁধা জীবন আপনাকে এতটা নির্জীব করে তুলেছে যে, আপনি কোনো কিছু করার আশা রাখা, কোনো কিছু অর্জনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা ভুলেই গেছেন। হয়তো ধরেই নিয়েছেন যে, আপনাকে দিয়ে আর কিছুই হবে না। অথবা বছরের পর বছর ধরে আপনার টার্গেট লিস্ট অক্ষরের আকারে কালো কালিতে কাগজের মাঝে বন্দী হয়ে আছে। কখনো সখনো সেটা নেড়েচেড়ে দেখা হয় ব্যস। এরচেয়ে বেশি কিছু করা হয় না।

- কখনো কি কুরআন কারিম হিফজ করতে মন চেয়েছে?
- কখনো আশা করেছেন যদি কুরআনে কারিমের জন্য একটা সময় নির্ধারণ করতেন?!
- মাস্টার্স বা ডক্টরেট করার কথা ভেবেছেন কখনো?
- নতুন ভাষা শিখতে চেয়েছেন?
- নিয়মিত ব্যায়াম করতে চেয়েছেন?
- লক্ষ করেছেন কি, বিয়ের পর আপনি বেশ মোটা হয়ে গেছেন?

- কিছু বই কিনে রেখেছেন। কিন্তু এখনো সেসব অপঠিত রয়ে গেছে?
- আপনি কি কোনো বিশেষ কাজ শুরু করতে চেয়েও করতে পারেননি?
- লিখতে ভালোবাসেন, কিন্তু লিখি লিখি করেও লেখা হয়ে ওঠে না?
- পরিবারের সাথে আরেকটু বেশি সময় কাটাতে চেয়েও হয়ে ওঠে না?

ফজরের সালাত। দ্য মিরাকল সালাত—আল্লাহর ইচ্ছায়—আপনার এসব লক্ষ্য ও আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারে। যেসব ইচ্ছা বছরের পর বছর ধরে অপূর্ণ থেকে গেছে, সেসব ইচ্ছা বাস্তব হতে পারে। আমি জানি, ফজরের পর থেকে অফিসে কাজে যাওয়া পর্যন্ত ঘণ্টাদুয়েকের মতো সময় পাওয়া যায়। কিন্তু যদি এ অল্প সময়ও আত্মোন্নয়নে ও লক্ষ্য পূরণে ব্যয় করেন, তাহলে অচিরেই আপনার জীবন পাল্টে যাবে।

ফজরের সময়টার সাথে দিনের অন্য সময়ের তুলনা চলে না। এ জন্য অমুসলিম সাইকোলজিস্টরাও এ সময়টাকে গুরুত্ব দিয়ে এটাকে নাম দিয়েছেন 'ম্যাজিক আওয়ার'। আর ফজরের সময়টাকে অন্য সময়ের মাধ্যমে বদলে দিতে চাইলেও ফজরের সময়ের মতো বরকত পাবেন না। কারণ অন্য সময়টা তো প্রিয় নবি ﷺ-এর দুআ অর্জন করেনি। প্রিয় নবি ﷺ দুআ করেছেন :

اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا

'হে আল্লাহ, আমার উম্মতের সকাল বরকতময় করে দিন।'[৪২]

পৃথিবীর সবচেয়ে সফল দশটি কোম্পানির চিফ এক্সিকিউটিভদের ওপরে পরিচালিত গবেষণায় দেখা গেছে, তাদের সবার মধ্যে যে বৈশিষ্ট্যটি কমন সেটা হচ্ছে, ভোর তিনটা থেকে পাঁচটার ভেতর ঘুম থেকে জেগে ওঠা।

আমি এমন অনেক বিজনেসম্যানের জীবনী পড়ে দেখেছি, যাদের ব্যাংক-ব্যালেন্স মিলিয়ন মিলিয়ন ডলারেরও বেশি। আমি দেখলাম, ভোরবেলা ঘুম ছেড়ে উঠে যাওয়া তাদের মৌলিক বৈশিষ্ট্য। এমনকি তাদের অনেকের বয়স সত্তর পার হয়ে গেলেও তাদের একই বৈশিষ্ট্য অটুট রয়েছে। তাদের কোনো

---

৪২. সুনানুত তিরমিজি : ১২১২। হাদিসের মান : সহিহ।

কাজ করার প্রয়োজন না পড়লেও তারা প্রত্যুষে ঘুম থেকে ওঠার ওপর অটল আছেন।

ফজরের সময়টা শ্রেষ্ঠ সময় হওয়ার কারণ হচ্ছে, ফজরের সময় আপনাকে কেউ ডিস্টার্ব করবে না। কারণ এ সময় অধিকাংশ মানুষ ঘুমিয়ে থাকে। তাই ফজরের পরের কয়েক ঘণ্টা সময় একান্তই আপনার নিজের। এ সময় কেউ আপনাকে কল করবে না। কেউ সাক্ষাৎ করার জন্য বলবে না। আপনি এ সময়টাকে আপনার কিছু লক্ষ্য অর্জনের কাজে লাগালেও আপনার দৈনন্দিন কাজের কোনো ক্ষতিই হবে না। আপনার উইশলিস্টের কাজগুলো করতে পারবেন অনায়াসে।

নিজেকে একটা সুযোগ দিন। নিজেকে সেসব বিশেষ মানুষের অন্তর্ভুক্ত করে নিন—পৃথিবীগ্রহের অধিকাংশ অধিবাসীর আগে যাদের দিন শুরু হয়ে যায়।

ফজরের দুই রাকআত সুন্নাত আদায় করার সময় আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে আপনার অনুভূতি হবে আপনি যেন পুরো পৃথিবীর চেয়ে বেশি মূল্যবান কিছু পেয়ে গেছেন। কারণ নবিজি ﷺ বলেছেন :

رَكْعَتَا الفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنيا وَمَا فِيهَا

> 'ফজরের দুই রাকআত সুন্নাত দুনিয়া ও দুনিয়ার সবকিছু থেকে উত্তম।'[৪৩]

ফজরের সালাত আপনাকে সে মর্যাদা দেবে, যা অন্য কিছু দিতে পারে না। ফজরের সালাতে আপনার উপস্থিতির কথা ফেরেশতাগণ মহান রব্বুল আলামিনের কাছে বলবেন। ফজরের সালাতের পর থেকে পুরো দিন আপনি মহাক্ষমতাধর মহাশক্তিশালী আল্লাহর জিম্মায় থাকবেন।

---

৪৩. সহিহ মুসলিম : ৭২৫।

ভোরের কল্যাণ

প্রত্যুষে ওঠার অভ্যাস আমাকে অনেক কিছুই দিয়েছে। আল্লাহর তাওফিকে আমি কুরআনের অনেক সুরা মুখস্থ করে ফেলেছি। যদিও প্রতিদিন মাত্র ১০ মিনিট বরাদ্দ করেছি কুরআন হিফজের জন্য। প্রতিদিন ২/৩ আয়াত মুখস্থ করি আর আয়াতগুলোর তাফসির পড়ি। প্রতিদিন ১০ মিনিট করে এভাবে নিয়মিত হিফজ করে গেলে এক মাসেরও কম সময়ে আপনি সুরা রদ, সুরা ইবরাহিম, সুরা হজ, সুরা নুর, সুরা ফুরকানের বেশকিছু অংশ এবং ২৯ ও ৩০ পারার অনেক সুরা হিফজ করতে পারবেন।

কখনো কি আপনার ভেতর কুরআনের হাফিজ হওয়ার ইচ্ছে উঁকি দিয়েছিল? যারা কুরআনওয়ালা, তারা আল্লাহর অলি ও তাঁর বিশেষ নৈকট্যপ্রাপ্ত। প্রতিদিন ১০ মিনিট কুরআন হিফজ করার রুটিন আপনাকে প্রায় পাঁচ বছরের মধ্যে কুরআনের হাফিজ বানিয়ে দেবে। কল্পনা করে দেখুন, আজ থেকে পাঁচ বছর পর আপনি কুরআনের হাফিজ হয়ে গেলেন, কত মর্যাদা ও সম্মানের অর্জন!

আগে আমাকে কিছু উদ্বেগ ঘিরে থাকত। চোখের সামনে দিয়ে একটা বছর চলে গিয়ে আরেকটা বছর আসে, আমি সে-ই আগের মতোই থেকে যাই। কিন্তু আমার জীবনে মিরাকল সালাতের যুগ যখন শুরু হলো, তখন থেকে একদিনে তিন আয়াত মুখস্থ করার টার্গেট আমার আনন্দ বাড়িয়ে দিতে থাকে প্রতিটি দিনে। একটার পর একটা দিন যেতে থাকে আর আমি নিজেকে আল্লাহর কিতাবের আরও বেশি নিকটবর্তী হতে দেখি। এমনকি যদি পুরো কুরআন হিফজ করার আগেই আমার মৃত্যু এসে যায়, তবুও পুরো কুরআন হিফজ করার নিয়তের পূর্ণ সাওয়াব পেয়ে যাব, সে আশা আছে। কারণ আল্লাহ তাআলা মহান দাতা, তিনি স্বল্প আমলের সাওয়াব বহুগুণ বৃদ্ধি করেন।

ভোরের কল্যাণে... কুরআন তিলাওয়াত আমার কাছে কেবল রমাজানের করণীয় আমলের লিস্টে থাকা বিশেষ মৌসুমের বিশেষ ইবাদত নয়। বরং প্রতিদিন সকালে কুরআন তিলাওয়াত করি আমি। ১০ মিনিট শুনে শুনে কুরআন তিলাওয়াত করি। অর্থাৎ আমি কোনো একজন কারির তিলাওয়াত শুনি এবং সাথে সাথে মুসহাফ থেকে সে আয়াতগুলো তিলাওয়াত করি।

এ পদ্ধতিটি বেশ কার্যকর। কারণ এভাবে আয়াতের মর্ম বুঝে আসে, তিলাওয়াতের সময় খুশু আসে। এমন ১০ মিনিটের তিলাওয়াত প্রায় এক পারা তিলাওয়াতের সমান। কেননা সংখ্যাধিক্য এখানে ধর্তব্য নয়। বরং তাদাব্বুরের সাথে তিলাওয়াতই অগ্রগণ্য। তাই দ্রুত পড়ে গেলে বেশি পড়া হবে, পরিমাণে বেশি হবে, এমন কিছুর দিকে না তাকিয়ে তাদাব্বুরের সাথে কুরআন তিলাওয়াত করুন।

আমি এক শাইখকে দেখেছি, তিনি এক রমাজানে কুরআনের তিলাওয়াত শুরু করে পরের রমাজানে খতম করেছেন। কারণ তিনি তাদাব্বুরের সাথে কুরআন তিলাওয়াত করছিলেন। প্রতিটি আয়াতের সামনে থামতেন। তাদাব্বুর করতেন। প্রতিটি শব্দের ব্যাখ্যা ও তাফসিরই নয় কেবল, তিনি প্রতিটি আয়াতের শানে নুজুল পড়তেন। এরপর এ আয়াতের সাথে পরের আয়াতের সম্পর্ক কী, কেন এ আয়াত ওই আয়াতের পরে আসলো প্রভৃতি পদ্ধতি অনুসরণ করতেন তার কুরআনের তাদাব্বুরে।

আমিও একই পদ্ধতিতে অনুশীলন করলাম। আক্ষরিক অর্থেই আমার জীবন পরিবর্তন হয়ে গেল। আমি একটি বই রচনা করে তাতে কুরআনের মাত্র ১০টি আয়াত নিয়ে আমার তাদাব্বুরের কথা তুলে ধরেছি। বইটির নাম : (آيات تغير حياتك)।

ভোরের কল্যাণে... প্রতি বছর আমি প্রায় ৪০টি বই পড়ে ফেলি। অথচ এর আগে এমন একটা সময় গেছে, যখন আমি বছরের পর বছর কোনো বইয়ের সামান্যই পড়তে পেরেছি।

প্রতিদিন সকালে এক ঘণ্টা বই পড়ি আমি। এক ঘণ্টাকে দুই ভাগ করে নিই। প্রতি আধা ঘণ্টায় একটা বই থেকে পড়ি। এভাবে এক ঘণ্টায় দুটি বইয়ের কিছু অংশ পড়া হয়ে যায়। এখন আমি এমন কয়েকটা বিষয়ের ওপর দক্ষ হয়ে উঠেছি, একটা সময় যেসব বিষয়ের নামের অর্থও জানতাম না।

গবেষণা বলে, প্রতিদিন এক ঘণ্টা করে পড়া এক বছরে ডক্টরেট অর্জন করার মতো। অনেক বই-ই আছে যার পৃষ্ঠা সংখ্যা দুইশ'র বেশি হয় না। দেখা গেছে সেসব বইতে লেখকগণ তাদের ৫০ বছরেরও বেশি দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতার

বয়ান শুনিয়েছেন আমাদের।

কল্পনা করে দেখুন, আপনি শাইখ শারাভি ﷺ-এর সাথে কথোপকথনে আছেন, তিনি আপনাকে আপনার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি নিয়ে তার সৃজনশীল ও অনুপ্রেরণামূলক কথা বলে যাচ্ছেন। অথবা ভেবে দেখুন, প্রতিদিন সকালে কফি খেতে খেতে আপনি ড. মুস্তফা মাহমুদ ﷺ-এর সাথে কথা চালাচালি করছেন। তিনি আপনার সামনে তার বহু বছরের গবেষণা ও অভিজ্ঞতার সারমর্ম তুলে ধরছেন। ব্যাপারটা চমৎকার না!

অথবা কল্পনা করুন, আপনি রিচার্ড ব্র্যানসনের সাথে সাক্ষাতে গেছেন। ভার্জিন গ্রুপ অব কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতার সাথে মতবিনিময় করছেন। তিনি আপনাকে বলে যাচ্ছেন শূন্য হাতে শুরু করেও কীভাবে তিনি চারশ সফল কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হলেন।

বই হচ্ছে সে-ই জানালা, যেটা দিয়ে আপনি বিশ্বের স্বরূপ দেখতে পাবেন।

ভোরের কল্যাণে... আপনার হাতে এখন যে বইটি রয়েছে, সেটি অস্তিত্বে এসেছে। এ কথা হলফ করে বলতে পারি যে, যদি ভোরবেলা ওঠার অভ্যাস না থাকত, তাহলে দিনের অনেক সময়ই আমার হাতছাড়া হয়ে যেত, এ বইটিও লেখার সময় পেতাম না। কেবল এ বইটিই নয়। পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ বই ভোরবেলার শান্ত পরিবেশে লেখা হয়েছে। যে ভোরবেলায় পাখির কলকাকলিতে প্রশান্তিতে ছেয়ে যায় হৃদয়, পাখিরা তাদের রিজিকের সন্ধানে দিনকে স্বাগত জানায়, সে ভোরবেলা কল্যাণে ভরপুর।

ভোরের কল্যাণে... আমি জীবন্মৃত মানুষদের দল থেকে ছুটে বেরিয়ে আসতে পেরেছি। অফিস ওয়ার্কের সীমাবদ্ধতায় যারা সন্তুষ্ট অথবা দৈনন্দিন জীবনের চাহিদা পূরণ করতে করতেই যাদের জীবন জরাজীর্ণ, স্থূল দেহ ও অস্বাস্থ্যকর দেহ নিয়ে যাদের কারবার—তাদের একজন হওয়া থেকে বেঁচে গেছি ভোরের কল্যাণে।

প্রতিদিন সকালবেলার ২০ মিনিটের ব্যায়াম আপনার জীবনকে আত্মিক ও শারীরিক উভয়ভাবে পরিবর্তন করে ফেলবে। জগিং করা, দৌড়ানো অথবা

ওয়েট লিফটিং কিংবা বাইসাইকেল চালানো ইত্যাদি ব্যায়াম থেকে যেকোনোটা বেছে নিন আপনার অবস্থা অনুযায়ী। কষ্ট হওয়ার কথা ভাববেন না, কষ্টের পর যে ফলটা পাবেন সেটা নিয়ে ভাবুন। সমস্যা নিয়ে ভাবতে ভাবতে দিন পার করে দেবেন না, সমাধান নিয়ে ভাবুন এবং তদনুযায়ী কাজ করে যান। আপনার স্বাস্থ্যের চাইতে গুরুত্বপূর্ণ কিছু নেই। তাই বাড়ির ভেতরে হোক বা বাইরে হোক প্রতিদিন ব্যায়াম করুন।

ব্যায়াম করলে আপনার শরীর প্রফুল্ল হবে, উদ্যমে ভরে যাবে। খিটখিটে মেজাজের ওপর জয়ী হতে পারবেন আপনি। কারণ ব্যায়ামের ফলে নির্গত এন্ড্রোপিন আপনার শরীরকে রিল্যাক্স করবে এবং স্ট্রেসের পরিমাণও কমাবে।

স্বল্প হলেও নিয়মিত

জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে সেটা, যে কাজটা দীর্ঘ দিন ধরে করা হয়। আরবদের প্রবাদে আছে, অবিরত ঝরতে থাকা পানির ফোঁটা পাথরও চিরে ফেলে। বিষয়টা এত জটিল নয়, যতটা আপনি ভাবছেন। ফজরের পরের সকালের সময়কে ২০ মিনিট/২০ মিনিট/২০ মিনিট করে ভাগ করে নিন। প্রথম ২০ মিনিট কুরআন তিলাওয়াত ও আল্লাহর স্মরণ করিয়ে দেয় এমন ওয়াজ শোনার জন্য। দ্বিতীয় ২০ মিনিট বই পড়ার জন্য। তৃতীয় ২০ মিনিট ব্যায়ামের জন্য।

এ কাজগুলো নিয়মিত করে যান। তাহলে খুব কম সময়ের মধ্যেই আপনি ফজরের সালাতের প্রেমে পড়ে যাবেন। সকালে ওঠা আপনার জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হবে। প্রিয় নবি ﷺ বলেছেন :

'আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় সে আমল, যে আমল পরিমাণে স্বল্প হলেও সর্বদা করা হয়।'[88]

আপনার লক্ষ্য পূরণের জন্য ফজরের সালাতের পরের সময়টাকে নির্দিষ্ট করে নিন। প্রতিদিন এর ওপর অটল থাকুন। প্রতিদিন সকালের যে সময়টা আপনার

---

৪৪. সহিহুল বুখারি : ৬৪৬৪।

লক্ষ্য-উদ্দেশ্য পূরণের জন্য ব্যয় করবেন আপনি, এ সকালটা আপনার পুরো দিনকে প্রফুল্লতা ও উৎসাহে পরিপূর্ণ করে দেবে। নতুন দৃষ্টিতে জীবনকে দেখার সুযোগ পাবেন। যা আপনাকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে। সকালের এ সময়টা আপনাকে একজন উত্তম মানুষ বানিয়ে দেবে।

বিছানার সাথে লড়াই

মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা জানিয়েছে, স্পেস শাটল পৃথিবীর চারপাশে প্রদক্ষিণ করার সময় যতটা জ্বালানি খরচ করে, তার সবচেয়ে বড় অংশটা স্পেস শাটলের লঞ্চ করার কয়েক মিনিটের মধ্যে খরচ হয়ে যায়। কেন? কারণ শুরুতেই তাকে পৃথিবীর প্রবল মধ্যাকর্ষণের ওপর জয়ী হতে হয়। এ স্তরটা পার হওয়ার পর স্পেস শাটলের জন্য মহাকাশে উড়তে থাকা সহজ হয়ে যায়।

আপনার ক্ষেত্রেও বিষয়টা একই রকম। ফজরের সালাতের জন্য ঘুম থেকে ওঠার সময় আপনার মোটিভেশনাল লেবেল একেবারে শূন্যের কোঠায় থাকে। সে সময়টাতে আপনার কাছে ঘুম ছাড়া অন্য কিছু একদমই পছন্দ হয় না।

তাই আপনার নফসের প্রবল আকর্ষণের ওপর ও শয়তানের ওয়াসওয়াসার ওপর জয়ী হতে আপনাকে তখন সবচেয়ে বেশি জোর লাগাতে হবে। এ লড়াইয়ে জেতার পর আপনার জন্য বাকিটা অনেক সহজ হয়ে যাবে।

আল্লাহর জিকির করুন। ঘুম ছেড়ে উঠে বসে পড়ুন। বিজ্ঞান বলে, পায়ের সাথে জমিনের স্পর্শ মানুষের মস্তিষ্কে ঘুম থেকে জেগে ওঠার ইঙ্গিত প্রেরণ করে। তাই ঘুম থেকে উঠে অজুর জন্য চলে যান। ভালো করে অজু করুন। চাইলে মাথাটা ধুয়ে নিন, যেন ঘুম থেকে জাগরণের অনুভূতিটা পূর্ণতা পায়।

ফজরের সালাতের জন্য উত্তম পোশাকটা পরার চেষ্টা করুন। আতর মেখে নিন। কারণ একটু পরই আপনি সকল বাদশাহর বাদশাহ মহান আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছেন, যাঁর হাতে সকল কিছু, যিনি সকল কিছুর মালিক। তা ছাড়া উত্তম সাজসজ্জা ও সুগন্ধি মাখার একটা সাইকোলজিক্যাল প্রভাব আছে। অজুর পর সাজসজ্জা ও সুগন্ধি মাখার ফলে আপনার মস্তিষ্ক বুঝে নেবে,

ঘুমের সময় পুরোপুরি শেষ হয়ে গেছে, এখন আপনি প্রস্তুত হয়ে দিন শুরু করে দিয়েছেন।

ঘুম থেকে জাগার সময় আপনার নফসের কথায় কান দেবেন না। আপনাকে সে বলবে, 'আরও দশ মিনিট ঘুমিয়ে নাও শরীর প্রফুল্ল ও কর্মঠ হবে।'

আপনি যদি নফসের কথা শুনে সে দশ মিনিট ঘুমান, তাহলে প্রফুল্ল না হয়ে আপনি আরও বেশি ক্লান্ত হয়ে পড়বেন। বিজ্ঞানীরা বলেন, সর্বসাকুল্যে গভীর ঘুমের সময় এক ঘণ্টা ৩০ মিনিট। এ সময়ের ভেতরেই গভীর ঘুম পূর্ণ হয়ে যায়।

ঘুম থেকে জাগার পর আবার যখন ১০ মিনিট ঘুমানোর সিদ্ধান্ত নেন আপনি, তখন আপনার মস্তিষ্ক এটাকে নতুন ঘুমের পালা হিসেবে ধরে নেয়। তাই আপনি যদি সত্যিই ১০ মিনিট পর বা আধা ঘণ্টা অথবা এক ঘণ্টা পরও ঘুম থেকে জাগেন, তবুও আপনার এক ঘুমের পালা (এক ঘণ্টা ৩০ মিনিট) পূর্ণ হবে না। ফলে আপনার শরীর জেগে উঠলেও আপনার মস্তিষ্ক তখনও ঘুমন্তই থেকে যাবে। ফলে আপনি আরও বেশি ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়বেন। এ ক্লান্তির কারণ এটা নয় যে, আপনি পর্যাপ্ত পরিমাণ ঘুমাননি; বরং ক্লান্তির কারণ হচ্ছে আপনি ভুল কৌশল অবলম্বন করেছেন।

ইতিপূর্বে আপনার এ অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে। আপনি জেগে উঠলেও আরও ১০ মিনিট ঘুমানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। ১০ মিনিট পর জেগে আরও বেশি ক্লান্তি অনুভব করলেন। তখন নিজেকে প্রাণবন্ত করার জন্য আবার ১০ মিনিট ঘুমানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু এভাবে বিঘ্নিত ঘুম ও ছাড়া ছাড়া ঘুমের কারণে আপনি ক্লান্তই থেকে যাবেন। কারণ প্রতিবারই আপনি নতুন ঘুমের পালা শুরু করেন, কিন্তু পালাটি সম্পূর্ণ করেন না। তাই এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে উত্তম সিদ্ধান্ত হচ্ছে, প্রথমবার যখনই ঘুম থেকে জাগ্রত হবেন, তখনই উঠে পড়ুন। এটাই সর্বোত্তম উপায়।

যারা বলেন, শরীরের জন্য আট ঘণ্টা ঘুমের প্রয়োজন, তারা আপনাকে ভুল তথ্য দিচ্ছে। এসব কুসংস্কার এক পাশে রেখে দিন। মানুষের গভীর ঘুমের সময় হচ্ছে এক ঘণ্টা ৩০ মিনিট। দেড় ঘণ্টায় আপনার ঘুমের একটা পর্ব পূর্ণ

হচ্ছে। তাই আপনার ঘুম হতে হবে দেড় ঘণ্টাকে গুণ করে। দেড় ঘণ্টার দ্বিগুণ : তিন ঘণ্টা। তিন গুণ : সাড়ে চার ঘণ্টা। চার গুণ : ছয় ঘণ্টা। পাঁচ গুণ : সাড়ে সাত ঘণ্টা। ছয় গুণ : নয় ঘণ্টা।

তাই যখন আপনি উল্লিখিত পরিমাণ সময় ঘুমিয়ে জেগে উঠবেন, তখন নিজেকে অনেক প্রফুল্ল ও শরীরকে অনেক কর্মঠ পাবেন। কারণ আপনার গভীর ঘুমের পালা পূর্ণ হয়েছে। পরীক্ষা করে দেখুন।

এটা সত্য যে, আপনি প্রতিদিন তাড়াতাড়ি ঘুমোতে যেতে পারবেন না। কখনো কখনো জরুরি কাজে আপনাকে রাত জাগতে হতে পারে। সে সময় দেরিতে ঘুমাতে হবে। এমন অবস্থায় ফজরের সালাত ছুটে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। কিন্তু আপনি কোনোভাবেই ফজরের সালাত ছাড়বেন না। এ ক্ষেত্রে 'দেড় ঘণ্টাকে গুণ' দেওয়ার পদ্ধতিটা ব্যবহার করুন। দেরিতে ঘুমানোর কারণে সময় কম। তাই তিন ঘণ্টার দুই পর্ব ঘুম অথবা সাড়ে চার ঘণ্টার তিন পর্বের ঘুম দিয়ে ফজরের জন্য উঠে পড়ুন।

এরপর সেদিন জোহরের পরে কিছু সময়ের জন্য কাইলুলা করে নিতে পারেন। তবে কাইলুলার সময় ৩০ মিনিটের বেশি হতে পারবে না। কখনো কখনো আমি ১০/২০ মিনিটের কাইলুলা করি। ১০/২০ মিনিটের কাইলুলার পর আমার কাছে মনে হয় যেন কয়েক ঘণ্টার ঘুম দিলাম, তবুও ঘুম অসম্পূর্ণ। কারণ ৩০ মিনিটের ঘুমের পর্ব পূর্ণ না করার কারণে আমার মস্তিষ্ক তখনও হালকা নিদ্রায় বিভোর। অন্যদিকে কাইলুলা যদি ৩০ মিনিটের বেশি করা হয়, তাহলে আপনি প্রচণ্ড ক্লান্ত হয়ে পড়বেন।

হয়তো কাইলুলার কথা শুনে আশ্চর্য হচ্ছেন আপনি। ১০/২০ মিনিট ঘুমালে কী এমন উপকার হয়! অভিজ্ঞতা কিন্তু আমাদের শেখায় যে, এ রকম কাইলুলা বেশ উপকারী। আমাদের অনেকেই কোথাও ভ্রমণের সময় অথবা বাসে বসে থাকার সময় ১০ মিনিট ঘুমিয়ে এরপর জেগে উঠে শরীর বেশ প্রাণবন্ত অনুভব করে। তেমনই ৩০ মিনিটের কাইলুলা আপনার জন্য যথেষ্ট।

পূর্বাহ্ন : সকালের উজ্জ্বল আলো

সুরা দুহা নাজিল হয়েছিল রাসুল ﷺ-কে সান্ত্বনা দিয়ে। ছয় মাস যাবৎ রাসুল ﷺ-এর ওপর ওহি নাজিল হচ্ছিল না। জিবরাইল ﷺ-ও এসে দেখা করছেন না। এদিকে মুশরিকরা বলাবলি শুরু করল, 'মুহাম্মাদের রব তাকে ত্যাগ করেছে, তার প্রতি নাখোশ হয়েছে।'

এ কথাগুলো নবিজি ﷺ-এর মনের ভেতর দাগ কাটল। তিনি ধারণা করলেন, আল্লাহ তাআলা এখন আর তাঁকে নবি হিসেবে চান না। তিনি বেশ চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন।

পরম দয়ালু আল্লাহ তাআলা নবিজি ﷺ-কে সুসংবাদ দিতে চাইলেন যে, তিনি তাঁকে ত্যাগ করেননি, তাঁর প্রতি নাখোশও নন, মুশরিকদের দাবি মিথ্যা। আল্লাহ তাআলা এমন একটা জিনিসের নাম ধরে কসম করলেন, যেটা ইতিবাচকতা, আশাবাদ ও আল্লাহর প্রতি নির্ভরতার দিকে উৎসাহিত করে। আল্লাহ তাআলা দুহা তথা পূর্বাহ্নের কসম করলেন। পূর্বাহ্ন, সূর্য উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত হওয়ার সময়টা। আল্লাহ বলেন :

وَالضُّحَى - وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى - مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى

> 'শপথ পূর্বাহ্নের। শপথ রাতের, যখন তা হয় শান্ত-নিঝুম। আপনার প্রতিপালক আপনাকে কখনো পরিত্যাগ করেননি, আর তিনি (আপনার প্রতি) অসন্তুষ্টও হননি।'[৪৫]

এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, শেষ রাতের গভীর অন্ধকারের পর আসা পূর্বাহ্নের সময়টা সৌভাগ্য, প্রফুল্লতা ও আত্মিক প্রশান্তি নিয়ে আসে।

যেন প্রত্যেক দুশ্চিন্তাদগ্ধ ও উদ্বিগ্নতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ মানুষের জন্য আল্লাহ তাআলা ভালোবাসা ভরে ওষুধ দিয়ে দিচ্ছেন, যে ওষুধের প্রথম উপাদান হচ্ছে আলোকিত সূর্যের পূর্বাহ্নকে পর্যবেক্ষণ ও অনুধাবন করা, যে পূর্বাহ্ন শান্ত-নিঝুম রাতের পর ফজরের সময় গড়িয়ে আমাদের সামনে আসে।

৪৫. সুরা আদ-দুহা, ৯৩ : ১-৩।

এই দুই সময়ের দৃশ্য যারা চাক্ষুষ দেখবে, তাদের মন আশ্চর্য ইতিবাচক শক্তি ও প্রফুল্লতায় ভরে যাবে। শান্ত-নিঝুম রাতের দৃশ্য : ফজরের সময়টা। আর আলোকিত সূর্যের দৃশ্য : পূর্বাহ্নের সময়টা। এ দৃশ্যদুটি দেখার সৌভাগ্য তাদেরই জোটে, যারা ফজরের সালাতের মাধ্যমে তাদের দিন শুরু করে।

কানাডার টরোন্টো ইউনিভার্সিটির গবেষকদের প্রস্তুতকৃত গবেষণা এ সত্যতা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। তারা ৭৩৫ জন ভলান্টিয়ারের ওপর এ গবেষণাটা করেন। এদের মধ্যে কিছু ছিল যুবক আবার কিছু ছিল বয়স্ক মানুষ।

দেখা গেছে, যারা রাত জাগতে পছন্দ করে, যাদের নিশাচর বলা চলে, ঘুম থেকে জাগার পর তাদের মধ্যে হতাশার অনুভূতি জন্ম নেয়। তুলনামূলকভাবে তাদের মেজাজের অবস্থা বেশি বিগড়ে থাকে। অন্যদিকে যারা রাতের বেলা ঘুমিয়ে সকাল সকাল সূর্য উদিত হওয়ার আগে জেগে যায়, তারা সাইকোলজিক্যাল এডভান্টেজ (মানসিক স্বস্তি) উপভোগ করে এবং তাদের ইমিউন সিস্টেম বা রোগপ্রতিরোধ ব্যবস্থা বেশি শক্তিশালী হয়।

গবেষণা থেকে আরও জানা যায় যে, ভোরবেলা ঘুম থেকে ওঠা লোকেরা প্রফুল্ল থাকার কারণ হচ্ছে, তারা প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক জীবনযাপন করে এবং তারা অনুকূল পরিবেশে কাজকর্ম করে, ফলে তারা প্রফুল্ল থাকতে পারে। অন্যদিকে যাদের নিশাচর বলা হয়, তারা দেরিতে ঘুম থেকে জাগার কারণে প্রকৃতিবিরুদ্ধ ও স্বভাববিরুদ্ধ জীবন পদ্ধতির সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া তাদের জন্য কঠিন হয়ে যায়, বিশেষ করে কাজের ক্ষেত্রে তারা অনুকূল পরিবেশের অভাব বোধ করে। যার ফলে তাদের মধ্যে দুশ্চিন্তা জন্ম নেয়, নিজেদের ও অন্যদের প্রতি ক্ষোভ তৈরি হয়, মেজাজ বিগড়ে থাকে।

চিকিৎসা-বিজ্ঞানে নতুন একটা বিষয় উঠে এসেছে। রোগ সংঘটনের সময় নিয়ে গবেষণায় দেখা গেছে, কিছু নির্দিষ্ট সময়ে মানুষ কিছু রোগে আক্রান্ত হয়। কার্ডিওলজি কনসাল্ট্যান্ট ড. হুসসাম মুআফি বলেন, '৮০% হার্ট স্ট্রোক ও ব্রেইন স্ট্রোক ঘটে সকাল আটটার দিকে।'

বিস্তারিত বলতে গেলে, সকাল আটটার সময় শরীরের ধমনী সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় থাকে। কারণ যখন রাত নামে, তখন ব্লাড সার্কুলেশন প্রবাহ ধীর হয়ে

আসে। ঘুমের সময় রক্তের এ ধীরগতির সার্কুলেশনের কারণে স্ট্রোক হতে পারে। কিন্তু মহান আল্লাহর দয়ায় মানুষের শরীর এমন একটা পদার্থ নির্গত করে, যা ধমনীকে সংকুচিত করে ব্লাড সার্কুলেশনের দ্রুত গতি ঠিক রাখে।

স্পষ্ট করার জন্য একটা উদাহরণ দিই। যখন আমরা পাইপ দিয়ে পানি ছাড়ি, তখন পানি একটা গতিতে নেমে আসে। কিন্তু যদি আমরা পাইপের মুখটা চেপে ধরি, তাহলে পানির প্রবাহ স্বাভাবিক গতির চেয়ে আরও বেড়ে যায়।

ডাক্তাররা দেখলেন, সকাল আটটার দিকে মানুষের ধমনী সবচেয়ে বেশি সংকুচিত হয়ে আসে, যার কারণে স্ট্রোক ঘটে। তাই ডাক্তারগণ সকালবেলা সূর্য ওঠার আগে ঘুম থেকে জেগে ওঠার পরামর্শ দেন। এতে যে পদার্থটা ধমনীকে সংকুচিত করে দেয়, সেটা চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে স্ট্রোক ঘটানোর আগে তার নিঃসরণ বন্ধ হয়ে যাবে।

মহান আল্লাহ তাআলা একই বিষয় ফজরের আজানের মাধ্যমে আমাদের শুনান :

الصلاة خير من النوم

'ঘুমের চেয়ে সালাত উত্তম।'

ওখানে একটি ঘর আছে

কিয়ামতের মাঠ। চারদিকে আমলনামা বিক্ষিপ্তভাবে উড়ছে। মিজান স্থাপন করা হয়েছে। আমল মাপা হচ্ছে। মানুষের চোহারাগুলো বিমর্ষ। শরীর ভয়ে কাঁপছে। সেসব মানুষের মধ্যে আপনিও চিন্তিত-উদ্বিগ্ন হয়ে কী হয় কী হয় শঙ্কা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আপনি জানেন না যে, আপনার পরিণতি কেমন হবে। মিজানের পাল্লায় আপনার নেকির পাল্লা ভারী হবে না গুনাহর পাল্লা!?

যা হারিয়ে গেছে তার জন্য শত আফসোস আর দুঃখ নিয়ে লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে আসছে আপনার। সামনে কী ঘটবে, তার সামান্য আভাসও পাচ্ছেন না। সবই অজানা। হঠাৎ করেই শুনলেন ফেরেশতারা জান্নাতিদের ডাকছেন। জান্নাতে প্রবেশকারীদের নাম ধরে ধরে তাদের নিয়ে যাচ্ছেন জান্নাত পানে। আপনি সেদিকে মনোযোগ দেওয়ার মতো মনোবল পাচ্ছেন না। মনের ভেতর আসন্ন দীর্ঘ হিসাবের ভয় কুরে কুরে খাচ্ছে আপনাকে। গুনাহর বোঝা বিশাল। গরম প্রচণ্ড। তখনই হঠাৎ করে শোনা গেল 'অমুকের ছেলে অমুক' বলে আপনার নাম নেওয়া হলো!

আপনি খেয়াল করে শোনার চেষ্টা করলেন।

নিজের কানকেও যে বিশ্বাস হচ্ছে না!

এ কী? আমার নাম?

আ...আমি জান্নাতি!

আমি কোথায় আর জান্নাতিরা কোথায়?!

কিছুই তো মিলছে না।

আমি কীভাবে শহিদ, মুত্তাকি আর সৎকর্মশীলদের সাথে প্রথমবারেই জান্নাতে যেতে পারছি?!

আরেকবার পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে কান পেতে ভালো করে শুনলেন। হ্যাঁ... আপনার নামই তো। এবার একজন ফেরেশতা এসে আপনার হাত ধরে আপনাকে একরকম টেনে নিয়ে যাচ্ছেন। বলছেন, 'ওখানে তোমার একটা ঘর আছে। যাবে চলো।'

জান্নাতে...একটা ঘর!

আমার!

কখন কীভাবে?

নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করছেন আপনি। এরপর জীবনের কাজকর্মসমূহের প্রতিটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ স্মরণ করার চেষ্টা করলেন। মনে হলো যেন সবকিছু নিমিষেই আপনার সামনে চলে এল। যারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে শহিদ হয়েছেন, আপনি তাদের একজন হতে পারেননি, আফসোস। যারা এমনভাবে ইবাদত করতেন যেন আল্লাহ তাদের সামনেই রয়েছেন, সেসব মুত্তাকির মধ্যেও পড়েন না আপনি, আফসোস। আপনার জীবনটা চলত কখনো গুনাহর মধ্যে, কখনো রবের পথে, কখনো অটল থাকতেন, কখনো বিচ্যুত হতেন।

তবে?!

মনের ভেতর ঝড় চলছে। জীবনের কাজকর্ম নিয়ে ভাবনায় ডুবে আছেন। সম্বিত ফিরে পেয়ে দেখলেন, আপনার সামনে আপনার ঘর, জান্নাতের ঘর। ঘরের ইট কোনোটা স্বর্ণের, কোনোটা আবার রুপোর। ইটের ওপরে সুগন্ধি মেশকের সিমেন্টের কাজ। তার মাটি জাফরানের। আর কঙ্করগুলো মূল্যবান মণিমুক্তো, ইয়াকুত ও মারজান পাথরের। সেখানে কাপড় জীর্ণ হবে না। যৌবনও শেষ হবে না। দেখলেন, ঘরের দরজার পলকে লেখা রয়েছে :

হ্যাঁ...এ রকমই বলেছেন প্রিয় নবি ﷺ :

مَنْ صَلَّى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ بُنِيَ لَهُ بِهِنَّ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ

> 'যে ব্যক্তি দিন-রাতে বারো রাকআত সুন্নাত সালাত আদায় করবে, তার পুরস্কার হিসেবে জান্নাতে তার জন্য একটি ঘর তৈরি করা হবে।'[৪৬]

এমনকি যদি একদিনের জন্যও এ আমল করেন, তাহলে এ আমলের পুরস্কার হিসেবে জান্নাতে আপনার জন্য একটি ঘর তৈরি করা হবে, এ আমল আপনার পক্ষে প্রমাণ হবে। এ আমল করার মাধ্যমে আপনি নিজের নামটা জান্নাতের অধিবাসীদের মধ্যে লিপিবদ্ধ করে নিলেন। ওখানে আপনার একটা ঘর আছে। মহা দয়ালু পরম করুণাময় আল্লাহ এমন কোনো বান্দাকে শাস্তি দেবেন না, জান্নাতে যার একটি ঘর আছে। তিনি সর্বোত্তম ন্যায়বিচারকারী। তাঁর প্রতিটি বিচারই ন্যায়বিচার। আপনি চাইলে প্রতিদিনই জান্নাতে একটি করে ঘর বানাতে পারেন আপনার জন্য।

কল্পনা করে দেখুন, আপনার হিসেব নেওয়া হচ্ছে, আপনার পাওনার খাতায় লেখা আছে, আপনি জান্নাতে শত শত ঘরের মালিক! কেনই বা আপনি জান্নাতে প্রবেশ করবেন না, আপনার হিসাব যিনি নেবেন, তাঁর দয়া তো সবকিছুকে বেষ্টন করে আছে, আপনি কেনই বা সে দয়া থেকে বঞ্চিত হবেন!

সুন্নাত সালাতের বিবরণ

- ফজরের ফরজ সালাতের আগে দুই রাকআত সুন্নাত। যদি হঠাৎ কোনো দিন সময়মতো আদায় করা সম্ভব না হয়, তাহলে সূর্যোদয়ের পর আদায় করার সুযোগ আছে।

- জোহরের ফরজ সালাতের আগে চার রাকআত, পরে দুই রাকআত। অথবা আগে দুই রাকআত, পরে চার রাকআত। মোট ছয় রাকআত।

---

৪৬. সহিহ মুসলিম : ৭২৮।

- মাগরিবের ফরজ আদায়ের পর দুই রাকআত।
- ইশার ফরজ আদায়ের পর দুই রাকআত।
- ২+৬+২+২ = মোট ১২ রাকআত।

এমনকি আমি তাকে ভালোবেসে ফেলি

আল্লাহ তাআলা হাদিসে কুদসিতে বলেন :

'আমার বান্দা আমার নিকটবর্তী হওয়ার জন্য যা কিছু অবলম্বন করে তন্মধ্যে আমার সবচেয়ে পছন্দনীয় মাধ্যম হচ্ছে ফরজ আমল। আমার বান্দা নফলসমূহ আদায়ের মাধ্যমে আমার নিকটবর্তী হতে থাকে এমনকি এক সময় আমি তাকে ভালোবেসে ফেলি। আমি যখন তাকে ভালোবেসে ফেলি, তখন আমিই হয়ে যাই তার কান, যা দিয়ে সে শোনে; আমিই হয়ে যাই তার চোখ, যা দিয়ে সে দেখে; আমিই হয়ে যাই তার হাত, যা দিয়ে সে ধরে; আমিই হয়ে যাই তার পা, যা দিয়ে সে হাঁটে। সে আমার কাছে যা চায়, আমি অবশ্যই তাকে তা দিই। সে আমার কাছে আশ্রয় চাইলে অবশ্যই আমি তাকে আশ্রয় দিই।'[৪৭]

সালাতকে না ভালোবাসলে আপনি নফল আমলগুলো নিয়মিত পালন করতে পারবেন না। যার মধ্যে সুন্নাত সালাতসমূহও রয়েছে। ফরজ আদায় করে দায়িত্ব শেষ করার স্তর থেকে আপনাকে ভালোবাসার স্তরে উন্নীত হতে হবে। প্রতিদিন আল্লাহর জিকির, তাঁর সম্পর্কে জানা, খুশু অর্জনের উপায়সমূহ বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে আপনি ইবাদতে ভালোবাসার স্তরে উন্নীত হতে পারবেন সহজেই।

একইভাবে দৈনন্দিন জীবনের সমস্যার সমাধানে সালাতের ওপর নির্ভর করুন। এটাকে সমস্যা সমাধানের হাতিয়ার বানিয়ে নিন। যেকোনো সমস্যা আসুক না কেন, রবের সামনে সালাতে দাঁড়িয়ে সমাধান চান। এরপর আপনি যখন এ আমলের সুফল দেখবেন, তখন আপনার অন্তরে সালাতের প্রতি ভালোবাসা বেড়ে যাবে, আপনি ফরজ সালাতের পর নফল সালাতে মগ্ন হবেন।

---

৪৭. সহিহুল বুখারি : ৬৫০২।

ফরজ সালাত আদায়ের পাশাপাশি নফল সালাত আদায় করার মাধ্যমে আপনি ফরজ সালাতকে সুরক্ষা দিতে পারবেন। নফল সালাতের মাধ্যমে আপনি নফস ও শয়তানের ওপর এমন একটা কঠিন আক্রমণ হানতে পারবেন যে, তারা কোনো ফরজ সালাত থেকে আপনাকে দূরে সরানোর জন্য আক্রমণ করার সুযোগই করতে পারবে না। কারণ এখন তো তাদের সামনে ধেয়ে আসা আক্রমণকে ঠেকাতে হবে, প্রথমে তারা নফল সালাত থেকে আপনাকে দূরে সরানোর কাজে লেগে পড়বে।

যখনই আপনি নফল সালাতের দুর্গের মাধ্যমে নিজেকে সুরক্ষিত করে নেবেন, তখন আপনার দুই শত্রু নফস আর শয়তান দুর্বল হয়ে পড়বে। আপনি যতই আপনার সালাতের সাম্রাজ্য বিস্তার করতে থাকবেন, এ দুই শত্রু ততই ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে। দুই শত্রু ভয় পেয়ে আপনার থেকে এত দূরে গিয়ে পালাবে যে, আপনি তাদের টুঁ শব্দটিও শুনতে পাবেন না।

সকল প্রশংসা সে আল্লাহর জন্য, যিনি তাঁকে ভালোবাসার রাস্তা স্পষ্ট বাতলে দিয়েছেন। যে তাঁকে ভালোবাসতে চায়, তার জন্য এ রাস্তা সহজ করে দিয়েছেন। এখন আমি চাই, আপনি মন থেকে সব জঞ্জাল মুছে ফেলুন... অন্য সব চিন্তাভাবনা বাদ দিয়ে শান্ত হয়ে যান... 'আল্লাহ আপনাকে ভালোবাসেন' এ কথার অর্থ কি কল্পনা করে দেখেছেন?

এ কথাটা যেভাবে নেওয়ার অভ্যাস আছে, সে অভ্যাস বাদ দিয়ে নতুন করে কথাটাকে অনুভব ও অনুধাবন করুন। ভেবে দেখুন, আল্লাহ আপনাকে ভালোবাসেন। কে ভালোবাসেন? আল্লাহ... সে-ই আল্লাহ, যিনি সকল কিছুর মালিক... যিনি সকল কিছু নিয়ন্ত্রণ করেন।

পৃথিবীর আদিকাল থেকে কত রাজা এল গেল। কত মানুষ ধনী হলো। কত মানুষ দরিদ্র ছিল। কত অবস্থার পরিবর্তন হলো। কত জাতির উত্থান হলো। কত জাতির পতন হলো। আর আল্লাহ... আল্লাহ হলেন আল্লাহ... তিনিই সকল কিছুর অধিপতি... তিনি অভাবমুক্ত... তিনি অমুখাপেক্ষী... তিনি অবিশ্বাসীদের অবনমনকারী... তিনি বিশ্বাসীদের উন্নীতকারী...

ভেবে দেখুন, আপনি আপনার জীবনে এক চিরস্থায়ী সত্তার কথামতো চলছেন... তাঁর সাথে আপনার যোগাযোগ, তাঁর সাথে সব সম্পর্ক, সব লেনদেন... ভেবে দেখুন, সে-ই আল্লাহ আপনাকে ভালোবাসেন!

যখন আল্লাহ আপনাকে ভালোবাসবেন, তখন আসমানবাসী আপনাকে ভালোবাসবে, জমিনের অধিবাসী আপনাকে ভালোবাসবে। প্রিয় নবি ﷺ বলেন :

যখন আল্লাহ কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন, তখন জিবরাইলকে ডেকে বলেন, "আল্লাহ অমুককে ভালোবাসেন, তুমিও তাকে ভালোবাসো।" তখন জিবরাইলও তাকে ভালোবাসেন। এরপর জিবরাইল আসমানবাসীকে ডেকে বলেন, "আল্লাহ অমুক বান্দাকে ভালোবাসেন, তোমরাও তাকে ভালোবাসো। তখন আসমানবাসী তাকে ভালোবাসে। এরপর পৃথিবীবাসীর অন্তরেও সে বান্দার প্রতি ভালোবাসা জাগিয়ে দেওয়া হয়।"'[৪৮]

আল্লাহ যখন আপনাকে ভালোবাসবেন, আপনাকে সাকিনা ও প্রশান্তি দান করবেন। সাকিনা সন্তুষ্টি, সৌভাগ্য, সুখ, শক্তি, আত্মবিশ্বাস, উন্নত মনোভাব, উন্নত পর্যবেক্ষণের সম্মিলিত রূপ। সর্বহারা হয়ে গেলেও কেবল সাকিনা থাকলেও জীবন যথার্থ ও সৌভাগ্যময় মনে হবে আপনার। আবার সবকিছু থেকেও সাকিনা না থাকলে জীবন দুঃখ ও দুর্ভাগ্যে ভরা মনে হবে।

যখন আল্লাহ আপনাকে ভালোবাসেন, তখন আপনি আত্মসন্তুষ্টি পেয়ে যান। এ সন্তুষ্টি পাওয়ার অর্থ দুনিয়ার বুকে জান্নাত পাওয়া। সন্তুষ্টি পেলে সবকিছু আপনার কাছে সুন্দর মনে হবে। আর যদি সন্তুষ্টি হারিয়ে যায়, তবে পুরো দুনিয়াটা আপনার হলেও নিজেকে দুর্ভাগা মনে হবে।

এমন অনেকের গল্পই আমরা জানি, যাদের কাছে দুনিয়ার সব উপভোগের সরঞ্জাম থাকা সত্ত্বেও দুশ্চিন্তা-উদ্বিগ্নতা যেন তাদের পিছুই ছাড়ে না। অন্যদিকে এমন অনেকের গল্প আমরা জানি, বহু পরিশ্রমের পরেও যাদের 'নুন আনতে পান্তা ফুরোয়' অবস্থা, তাদের মনের ভেতর যে সুখ বিরাজমান, তা যদি পুরো শহরে বণ্টন করে দেওয়া হতো, তবে শহরের সব মানুষের জন্য যথেষ্ট হতো।

---

৪৮. সহিহুল বুখারি : ৬০৪০।

আবার এমন খুব কম মানুষই আছেন, যারা দুনিয়ার অনেক সম্পদের মালিক সাথে সাথে তারা সন্তুষ্টির নিয়ামতও পেয়েছেন, এমন মানুষেরা নিজেরাও সুখী হয়, আশপাশের মানুষদেরও সুখী রাখে। মোটকথা, সন্তুষ্টি হচ্ছে মানুষের সুখের মূল চাবিকাঠি।

যখন আল্লাহ আপনাকে ভালোবাসবেন, তখন তিনি আপনাকে প্রজ্ঞা দান করবেন। ফলে আপনি বিপদে বিচলিত হবেন না, সুখে প্রতারিত হবেন না। এক বৃদ্ধার গল্প। আল্লাহ তাআলা যাকে প্রজ্ঞা দান করেছেন। তার একটি ফসলের খেত ছিল। একদিন তার খেতের সব ফসল পুড়ে গেল। তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বললেন, 'আপনার যা ইচ্ছে হয় করুন। আমার রিজিক দেওয়ার ভার তো আপনার ওপর।'

এক বাগানের মালিক ছিল প্রজ্ঞা থেকে বঞ্চিত। সে এক লোককে বলল :

أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرً

'আমি ধনবল ও জনবলে তোমার চেয়ে শক্তিশালী।'[৪৯]

এরপরের ঘটনা :

وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا

'(অতঃপর এই ঘটল যে) তার সমুদয় ফল-ফসল আজাববেষ্টিত হয়ে গেল এবং তার সকাল হলো এমন অবস্থায় যে, বাগানে যা কিছু ব্যয় করেছিল, তার জন্য সে (আক্ষেপে) হাত কচলাতে লাগল, যখন তার বাগান মাচানসহ ভূমিসাৎ হয়ে গিয়েছিল।'[৫০]

আল্লাহর ভালোবাসা জীবনের আসল লক্ষ্য হিসেবে স্থির করো,
এই একটি সূত্রে পাবে জীবনের সব সমীকরণের সমাধান।

---

৪৯. সুরা আল-কাহফ, ১৮ : ৩৪।
৫০. সুরা আল-কাহফ, ১৮ : ৪২।

আল্লাহর ভালোবাসা

আল্লাহর ভালোবাসা সালাতের ভালোবাসার সঙ্গে এক সূত্রে গাঁথা।

সালাতকে ভালোবাসো আল্লাহর ভালোবাসাও পাবে।

আল্লাহ যেমন বলেছেন, 'আমার বান্দা নফলসমূহের মাধ্যমে,

আমার নিকটবর্তী হতে থাকে, এমনকি তাকে ভালোবেসে ফেলি আমি।'

সালাতের পরিকল্পনা

ধরুন, একজন ইঞ্জিনিয়ার কোনো রকম পরিকল্পনা বা প্ল্যান ডিজাইন ছাড়াই একটা ঘর তৈরি করছে। ফাউন্ডেশন তোলা ছাড়াই সে মিস্ত্রিদের বলল কাজ শুরু করে দিতে। যখন সে দেখল, সে একটা মারাত্মক ভুল করে ফেলেছে, তখন মিস্ত্রিদের বলল ভেঙে আবার নতুন করে শুরু করতে। যেন এবার সঠিকভাবে ফাউন্ডেশন দিয়ে কাজটা করা যায়।

ফাউন্ডেশনের জন্য মাটি খোঁড়া হলো। নতুন করে নির্মাণ কাজ শুরু হলো। কিন্তু কিছু সময়ের মধ্যে আরেকটা ভুল সামনে এল যে, ফাউন্ডেশনের পিলারগুলো ঠিকভাবে তৈরি করা হয়নি। ফলে পুনরায় ভাঙা শুরু হলো। পরিকল্পনাহীন কাজটি এভাবে ভাঙা ও গড়ার খেলায় পরিণত হলো...

ঘর তৈরির ক্ষেত্রে পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি অবশ্যই প্রয়োজনীয়। কেবল পরিকল্পনা না করা ও নির্মাণ কাজের উত্তম প্রস্তুতি না থাকার কারণে এ ইঞ্জিনিয়ারের ভুলের পরিমাণ কতটুকু হতে পারে সেটা ভেবে দেখুন।

আমরা অধিকাংশই এভাবে পরিকল্পনাহীন জীবনযাপন করি। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কাজগুলো সহজ ও সঠিকভাবে করার জন্য কোন পদ্ধতি সবচেয়ে উত্তম হবে, সেটা না জেনেই আমরা দিনের পর দিন কাটিয়ে দিচ্ছি। কোন কাজটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ আর কোনটি কম গুরুত্বপূর্ণ, এই বিবেচনাও আমরা করি না। ফলে আমাদের জীবন ভুল পথে পরিচালিত হয়। অনর্থক কথাবার্তায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা নষ্ট করতে আমাদের একটুও বাধে না।

নানান অপ্রয়োজনীয় কাজ করে আমরা শারীরিক ও মানসিকভাবে ক্লান্ত হয়ে পড়ি।

তাই জীবন থেকে শিক্ষা নিয়ে বলি, সালাতের পাবন্দ না হতে পারার সবচেয়ে গুরুতর কারণগুলোর একটি হচ্ছে, সালাতের জন্য সঠিক পরিকল্পনা না থাকা। কীভাবে আপনি জোহরের সালাত আদায় করবেন, যদি আপনি একই সময়ে ডাক্তারের এপয়েন্টমেন্ট নেন?!

অথবা আসরের সালাতের সময়টি যদি অফিসে নতুন কাজের ব্রিফিং দেওয়ার জন্য নির্ধারণ করেন, তাহলে কীভাবে আসরের সালাত আদায় করবেন?! কিংবা কিছু দিন দূরে থাকা বন্ধু শহরে ফিরে এসেছে, এখন একসঙ্গে খাওয়ার জন্য তাকে নিয়ে হোটেলে যাওয়ার সময় নির্ধারণ করলেন মাগরিবের সালাতের সময়টা, তাহলে কীভাবে আপনি মাগরিবের সালাত আদায় করবেন?!

ভুলে ভরা পরিকল্পনা আপনাকে শয়তান ও নফসের খেলনায় পরিণত করে। ফলে আপনি সালাত আদায় করতে ব্যর্থ হন। যখনই সালাতের সময়টিকে আপনি অন্য কোনো কাজের জন্য নির্ধারণ করেন, তখনই আপনার সামনে সবার আগে যে অজুহাতটা এসে দাঁড়ায় সেটা হচ্ছে, হাতের কাজটা শেষ করেই সালাত আদায় করব। এরপর যখন হাতের কাজটা শেষ হয়ে যায়, তখন সালাত আদায় করাটা অনেক কঠিন হয়ে যায়, কারণ সালাতের প্রথম ওয়াক্ত ততক্ষণে চলে গেছে। শয়তান সে সময়টাতে তার সব ষড়যন্ত্রের অস্ত্র প্রয়োগ করে নিশ্চিত করেছে, আপনি যেন কানে আজান না শুনেন। কারণ আজান শোনা সালাতের প্রতি উৎসাহিত করে এবং শয়তানের ষড়যন্ত্র ভেস্তে দেয়। তাই ভুল পরিকল্পনা করে নিজেকে শয়তান ও নফসের খেলনায় পরিণত করবেন না।

সাজানো গোছানো দিন

যদি সালাতের সময় হওয়ার ব্যাপারে হঠাৎ করে সচকিত হওয়ার অভ্যাস থাকে, তাহলে কখনোই আপনি সর্বোত্তমভাবে সালাতের পাবন্দ হতে পারবেন না। হঠাৎ করে আজান শুনে জানতে পারলেন সালাতের সময় হয়েছে, তখন আপনি কোনো একটা কাজে নিজেকে নিয়োজিত দেখবেন। তখন এমন অবস্থা আপনার সালাত আদায়ের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়াবে।

তাই আপনার দিন সাজিয়ে নিন, আপনার কাজগুলোকে বিন্যস্ত করে ফেলুন। কাজের ফাঁকে ফাঁকে আপনি সালাত আদায় করবেন এমন যেন না হয়; বরং সালাতের ফাঁকে ফাঁকে আপনি কাজগুলো সারবেন। সালাত হবে মূল পয়েন্ট। এটিকে কেন্দ্র করে আপনার কাজগুলো আবর্তিত হবে। সালাতকে যদি আপনার কাজের অনুগামী করেন, তাহলে সালাত ছুটে যাবে। তাই আপনার সকল কাজকে সালাতের অনুগামী করুন।

আপনার কাজের সময়কে এমনভাবে গুছিয়ে নিন যেন সব কাজ সালাতের ওয়াক্তসমূহের মাঝখানে পড়ে, সালাতের সময় যেন কোনো কাজ না থাকে।

আমার এক শিক্ষকের কথা। যাদের সালাত ছুটে না, তিনি তাদের একজন ছিলেন। তিনি তার পাঠদান ও সাক্ষাতের সময়টা নির্ধারণ করতেন সালাতের পরে। উদাহরণত, কেউ যদি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাইত, তাকে বলে দিতেন, 'আমরা আসরের সালাতের পর দেখা করব' অথবা 'আজকের ক্লাস হবে ইশার সালাতের পর।'

এভাবে সময় নির্ধারণ করে দেওয়ার পরও একবার এক লোক জিজ্ঞেস করল, 'কয়টায় হবে?' তিনি বললেন, 'সঠিক সময়টা তো বলতে পারছি না। যদি আসরের সালাত রাত নয়টায় হয়, তাহলে রাত নয়টার পর হবে।'

কাজের এ রকম সুন্দর বিন্যাস সালাতে পাবন্দ হতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। আমার শিক্ষকের মতো আমিও একই অভ্যাস চর্চা শুরু করি। ফলে আমার জীবনের বিন্যাসে সালাতের ওয়াক্তসমূহ হয়ে যায় ফাউন্ডেশনের পিলারের মতো, যার ওপর আমি আমার অফিসের কাজ ও অন্যান্য কাজকে প্রতিস্থাপিত করে একটি সুন্দর জীবনঘর তৈরি করি।

মহাপ্রজ্ঞাবান আল্লাহ তাআলা সালাতকে বিভিন্ন ওয়াক্তে ফরজ করার কারণ হচ্ছে, যেন আমরা আমাদের জীবনকে সালাতের মাধ্যমে সাজিয়ে নিই। তাই ফজরের পর থেকে অফিসের কাজে যাওয়া পর্যন্ত কিছু কাজের রুটিন রাখুন, ফজর পড়ে এসব কাজ সম্পন্ন করুন।

সকালে কর্মক্ষেত্রে এসে সেসব কাজকে আগে করুন, যেগুলো জোহরের সালাতের আগে করা গুরুত্বপূর্ণ। যেসব কাজ জোহরের সালাতের পরে ও আসরের সালাতের আগে করলে চলবে, সেসব কাজ জোহর ও আসরের মধ্যবর্তী সময়ে করুন।

এরপর আসর ও মাগরিবের মধ্যবর্তী সময়টা পুরো দিনের কাজের পরে আরামের জন্য রাখা যায়। আরামের সময়ের শেষ সীমা হবে মাগরিবের সালাতের আগ পর্যন্ত।

যে কাজই আসুক না কেন, সে কাজকে সালাতের ওয়াক্তসমূহের মাঝখানে ফেলুন। দেখবেন, আল্লাহ তাআলা সময়ে বরকত দান করেছেন।

সুখী হওয়ার রেসিপি

জর্জ বারনার্ড শ সুখী হওয়ার রেসিপিকে এ কথায় ব্যক্ত করেছেন, 'দুঃখী হওয়ার অনুভূতি তখনই আসে, যখন "আমি সুখী না অসুখী?" প্রশ্ন করার মতো অবসর থাকে।'

বারনার্ড শ সত্য বলেছেন। অবসর মারাত্মক প্রাণঘাতী বিষ। তাই নিজেকে কোনো না কোনো কাজে ব্যস্ত রাখুন। যেন দুশ্চিন্তা বা উদ্বিগ্নতা আসার ফাঁক না থাকে। আপনাকে জরুরি কোনো কাজে কিংবা অফিসের কাজে ব্যস্ত থাকতে হবে এমন কথা নেই। বরং অফিস শেষে বাড়ি ফিরে একাকী অলস সময় পার না করে আপনার বাচ্চাদের সময় দিন কিংবা স্ত্রীর সঙ্গে বিনোদনে মেতে উঠুন।

দুই সালাতের মধ্যবর্তী সময়টাকে বিভিন্ন কাজে পূর্ণ করে নিন আর সালাতের সময়টা হবে সব ধরনের কাজ থেকে ছুটি পাওয়ার সময়। আমি নিশ্চয়তা দিচ্ছি, বিইজনিল্লাহ, আপনি রাতে প্রশান্তির ঘুম ঘুমোতে পারবেন।

অবসরকে আপনার ওপর আঘাত হানতে দেবেন না। কারণ কাজহীন একটা দিন মানুষের মস্তিষ্কের জন্য অনেক ক্ষতিকর।

যখন আমরা কাজের মাঝে ডুবে থাকি, তখন দুশ্চিন্তা আমাদের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে না। কিন্তু যখনই কাজের পর অবসর হয়ে যাই, তখন এ অলস সময়টা আমাদের সুখ বরবাদে উঠেপড়ে লাগে। কর্মহীন বেকার দিনগুলোতেই আপনার অন্তরে দুশ্চিন্তার আঘাত আসার আশঙ্কা প্রবল। এমন দিনেই হতাশা ও আশঙ্কার শয়তানগুলো আপনার ওপর আক্রমণ করে আর আপনি অতীত-ভবিষ্যতের কথা ভাবতে ভাবতে বর্তমানের সুখ মাটি করেন।

মনোরোগ বিশেষজ্ঞরা যুদ্ধফেরত সৈনিকদের ওপর এই কৌশলটি প্রয়োগ করেছেন। যুদ্ধের ময়দান থেকে যখন তাদের কাছে নানান মানসিক রোগে আক্রান্ত সৈনিকরা আসে, তারা তাদেরকে যেকোনোভাবে কাজে ব্যস্ত করে ফেলেন। যেমন : মাছ ধরা, বল খেলা, বাগান করা। এ ব্যস্ততা তাদেরকে অতীত অভিজ্ঞতা নিয়ে ভাবার তেমন সুযোগ দেয় না।

কাজে ডুবে থেকে প্রশান্তি ও সুখের অনুভূতি আনয়ন করে মানুষের স্নায়ুকে শান্ত রাখার এ চিকিৎসা পদ্ধতিকে নাম দেওয়া হয়েছে Occupational Therapy।

রিচার্ড বেয়ার্ড তার বই Alone-এ তুলে ধরেছেন নিজেকে কাজে ব্যস্ত করে রাখা কীভাবে তাকে জীবন্ত রেখেছে। পৃথিবীর দক্ষিণ মেরুর তুষারাবৃত অঞ্চলে একটি তাঁবুতে ১৫ মাস একাকী কাটিয়েছেন তিনি। তার পাশে কেউ তো ছিলই না, তার একশ মাইল দূরত্বেও কোনো মানুষের অস্তিত্ব ছিল না। রিচার্ড বলেন, 'বিছানায় গিয়ে বাতি নেভানোর আগে আমি আগামী দিনের কাজগুলোর পরিকল্পনা এঁটে নিতাম। আমার পরবর্তী দিনটিকে কয়েক ঘণ্টা করে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করে নিতাম। দুই ঘণ্টা বরফে সুড়ঙ্গ তৈরির জন্য। এক ঘণ্টা জমে থাকা বরফ সরানোর জন্য। এক ঘণ্টা বুকশেল্প তৈরির কাজে। এভাবে আমি সময় কাটাতাম। আমি মনে করি, যদি এ পদ্ধতিতে সময়টা না কাটাতাম, তাহলে আমার দিনগুলো লক্ষ্য-উদ্দেশ্যহীন হয়ে পড়ত আর আমি নিশ্চিত মরে যেতাম।'

সুখী হওয়ার মূলমন্ত্র নিজেকে কাজে ব্যস্ত রাখা। তাই ঘুণাক্ষরেও ধারণা করবেন না যে, কিছু না করাই আরাম ও সুখ। বরং কাজেই সুখ। তাই সালাতের ওয়াক্তসমূহকে ঘিরে আপনার দিনকে বিন্যস্ত করে নিন। সালাতের ওয়াক্তসমূহের মধ্যকার সময়গুলোকে বিভিন্ন কাজের জন্য ভাগ করে নিন, যেন দুশ্চিন্তা-উদ্বিগ্নতার কোনো ফাঁকফোকর না থাকে। এভাবে সালাতে সালাতে জীবন্ত হয়ে উঠুন... চেষ্টা করে দেখুন।

যেসব বোকামি করেছি

এ কথাটা ছিল বিখ্যাত আমেরিকান লেখক ডেল কার্নেগির ডেস্কের ড্রয়ারের একটা ফাইলের নাম। মিলিয়ন মিলিয়ন বই বিক্রি হওয়া এ বেস্ট সেলার লেখক বলেন, তিনি জীবনে যেসব ভুল ও বোকামি করেছেন, সেসব দিয়ে পরিপূর্ণ তার 'যেসব বোকামি করেছি' নামের ফাইলটা। তিনি এ ফাইল খুলে বারবার পড়েন। কারণ এটা পড়লে তার মাঝে আত্মবিশ্বাস আসে। নিজের অতীত বোকামি থেকে তিনি শক্তি নেন আরও কঠিন সমস্যা মোকাবিলা ও ভবিষ্যৎকে আরও সুন্দর করার জন্য।

নিজের জীবনকে সুন্দর করতে ও পৃথিবীতে নিজের পদচিহ্ন রেখে যেতে এ কৌশলটি কেবল ডেল কার্নেগিই প্রয়োগ করেননি; গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে বিশ্বের সবচেয়ে সেরা সেলসম্যান হিসেবে নাম তোলা জো গিরার্ড একই কৌশল অবলম্বন করেছেন। জো গিরার্ড How To Sell Anything To Anybody (কীভাবে কারও কাছে কোনো জিনিস বিক্রি করবেন) নামে একটি বই লেখেন।

জো গিরার্ড বলেন, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সেলসম্যান হওয়ার ক্ষেত্রে তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নীতি ছিল নিজের বোকামি থেকে শেখা। তিনি নিজের ব্যর্থ ব্যবসায়িক চুক্তিগুলোর ফাইলসমূহ বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতেন, খুঁজে বের করতেন তার ব্যর্থতার কারণ। নিজের ভুল থেকে শিখতেন। দ্বিতীয়বার ভুলের পুনরাবৃত্তি যেন না হয় সেটা নিশ্চিত করতেন। এভাবে তিনি রেকর্ড পরিমাণ সফল ব্যবসায়িক চুক্তি করে ফেললেন একসময়।

বলা বাহুল্য, ভুল থেকে শেখার এ কৌশলটির কারণেই আজ আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে ঘিরে এত বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত উন্নতি দেখতে পাচ্ছি।

আজকে আমরা গাড়িতে চড়ে আরামে ভ্রমণ করি। যদি লোহার ডিপোসদৃশ ইতিহাসের প্রথম গাড়ির মেকানিজমের ভুল থেকে শিক্ষা না নেওয়া হতো, তাহলে এত সুন্দর সুন্দর অত্যাধুনিক গাড়ি তৈরি হতো কি?! যদি অতীত বিমান বিপর্যয়ের ভুলসমূহ থেকে—আল্লাহর দয়ায়—শিক্ষা না নেওয়া হতো, তাহলে বর্তমানে বিমান দুর্ঘটনা কি কমানো যেত?!

সুখী জীবন পাওয়ার উত্তম ও দ্রুততর উপায় হচ্ছে অতীত ভুল ও বোকামি থেকে শেখা। একই কথা প্রতিটি ব্যক্তি, প্রতিটি কোম্পানি, প্রতিটি দেশের উন্নতির জন্য প্রযোজ্য।

ভুল থেকে শেখা

ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আমাকে বলতেই হচ্ছে, আপনার অতীত জীবন এমন সব ভুল ও বোকামিতে পূর্ণ, যা আপনার ও সালাতের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি করে রেখেছে। এখন সেসব ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে আপনার কল্যাণে সে শিক্ষা ব্যবহার করা সম্ভব।

একটা উত্তম জীবনযাপন করতে আপনি যে অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করতে পারেন, সে উৎসটা হচ্ছে আপনার অতীত। আপনি যত বই পড়েন, যত তথ্য-উপাত্তই হাসিল করেন না কেন, এসব আপনার অতীত অভিজ্ঞতার বিকল্প হতে পারে না। কারণ একমাত্র আপনার অতীতই আপনার জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট তথ্য ও অভিজ্ঞতা সরবরাহ করতে পারে।

সালাতকে কাজে লাগিয়ে যারা দুনিয়া ও আখিরাতে সৌভাগ্যবান হয়েছেন, আপনিও যদি তাদের একজন হতে চান, তবে এই কৌশলটি প্রয়োগ করতে পারেন। এখন নফস ও শয়তানের বিরুদ্ধে আপনার একটি তীব্র যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। হয়তো কিছু সময়ের জন্য পরাজয় আপনার পিছু ছাড়বে না। কিন্তু একই ভুল দুবার করবেন না। যখনই আপনি নফস ও শয়তানের সামনে দুর্বলতা দেখাবেন, তখনই আপনার সালাত ছুটে যাবে। যেবার ভুল হবে,

সেবারের পুরো চিত্রটা বিস্তারিত বিশ্লেষণ করুন, পরাজয়ের কারণ খুঁজে বের করুন; যেন দ্বিতীয়বার একই ভুল আর না হয়।

জনৈক প্রাজ্ঞ বলেন, 'বোকা লোক একই ভুল দুবার করে। বুদ্ধিমান একবার ভুল করলেও দ্বিতীয়বার করে না। আর বিচক্ষণ লোক বোকা ও বুদ্ধিমানের ভুলগুলো দেখে শেখে এবং নিজে সেসব ভুল করে না।'

আমি ও আপনি বিচক্ষণ হতে না পারলেও অন্তত বুদ্ধিমানদের দলের হব। তাই যখনই সালাত ছুটে যায়, তখন আমরা কারণ খুঁজে বের করব, ভুল থেকে শিখব, সেটার পুনরাবৃত্তি করব না।

যাদের সালাত ছুটে না, তাদের সাথে আমার সাক্ষাতের সময় আমি ধরতে পেরেছি, তারা অবচেতন মনে 'ভুল থেকে শেখা'র কৌশলটা ব্যবহার করেন। ফলে তাদের এমন কিছু শক্তপোক্ত অভ্যাস গড়ে ওঠে, যা সালাতের সাথে অতীতের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে তৈরি হয়।

উদাহরণস্বরূপ, তাদের অধিকাংশই বাড়ি থেকে বের হওয়ার আগে অজু করে নেন। ফলে বাড়ির বাইরে থাকা অবস্থায় সালাতের সময় হলে তাদের জন্য সালাত আদায় সহজসাধ্য হয়। এভাবে তারা অজুর মাধ্যমে শয়তানের প্রথম ওয়াসওয়াসাকে প্রতিহত করে ফেলেন।

আমরা সবাই জানি, আমরা যখন ঘরের বাইরে থাকি, তখন শয়তান আমাদের এভাবে ওয়াসওয়াসা দেয় যে, জুতো খুলব, মোজা খুলব—বেশ ঝামেলার ব্যাপার তো! তখন আমাদের মনে হয়, একটি দাঁতের অসুখের জন্য যেন আমরা পুরো একপাটি দাঁত উপড়ে ফেলছি। অজু করে সালাত পড়তে গেলে তো প্যান্ট ভিজে যাবে, আমাকে অগোছালো দেখাবে। অথচ তারপরই তো অফিসের একটা মিটিং আছে! এখানে শয়তানের সামনে এ ওয়াসওয়াসা দিতেও বাধা থাকে না যে, জুতো বাইরে রেখে যাব? যদি চুরি হয়ে যায়! যদি মসজিদে দামি ঘড়িটা ভুলে ফেলে রেখে যাই?!

কেবল অজু নিয়েই শয়তান আমাদের শত শত কুমন্ত্রণা দিয়ে ওয়াসওয়াসা দিতে পারে। যার শেষ ফলাফল, আমরা বাড়িতে গিয়ে সালাত আদায় করব

বলে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি। অবশেষে যখন বাড়ি ফিরি, ততক্ষণে সালাতের ওয়াক্ত শেষ হয়ে যায়। আর আমি-আপনি সবাই জানি, বাড়িতে ফিরে এলে আরও প্রচণ্ড লড়াইয়ের সম্মুখীন হতে হয়। অবশেষে সালাত ছুটে যায়।

যারা নিয়মিত সালাত আদায়ে সাফল্য লাভ করেছেন, তাদের দিকে তাকালে আপনি দেখবেন, আজান শোনামাত্রই তারা সালাতের দিকে অগ্রসর হন। কোনো বাধার ধার ধারেন না। তারা জানেন যে, সালাতকে যতই বিলম্বিত করা হবে, ততই সালাত আদায় কঠিন হয়ে পড়বে।

তাই সর্বদা ওয়াক্ত হওয়ার আগে সালাতের জন্য প্রস্তুত থাকুন, যেন আপনার নফস কোনো পথ না পেয়ে আপনার অনুসরণে বাধ্য হয়।

এখানে সাইকোলজির একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি বলছি। এটিকে বলা হয় : Five Seconds Rule। এ নীতির মর্মকথা হলো, দৈনন্দিন জীবনে ছোট ছোট সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে মানুষের হাতে সময় থাকে কেবল পাঁচ সেকেন্ড। এই পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে কোনো চিন্তা সিদ্ধান্তে রূপ নিয়ে কাজের আকারে প্রকাশ পায় অথবা বাতিল হয়ে উবে যায়।

ধরুন, সকালবেলা এলার্ম শুনে পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে উঠে যদি শরীর থেকে অলসতা ঝেড়ে না ফেলেন, তবে আপনি আবার ঘুমের মাঝে হারিয়ে যাবেন। তেমনই আপনার ডায়েট প্ল্যানের ক্ষেত্রে, আপনি কি সুগারে ভরপুর কেক খাবেন কি খাবেন না, সে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্যও আপনার মস্তিষ্কের কাছে মাত্র পাঁচ সেকেন্ড সময় থাকে।

একই কথা সালাতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আজান শোনার মাত্র পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে যদি আপনি বিছানা ছেড়ে অজুর জন্য বা মসজিদের দিকে না যান, তাহলে আপনাকে নফস ও শয়তানের বিরুদ্ধে সালাতের ব্যাপারে যুদ্ধে লিপ্ত হতে হবে।

ফজরের সালাতে নিয়মিত হওয়ার ব্যাপারে আমি আমার ভুল থেকে আল্লাহর করুণায় যে জিনিসটা শিখেছি সেটা হচ্ছে, আবহাওয়া যেমন হোক না কেন ঘুম থেকে উঠেই গোসল করে নেওয়া, অন্তত ঠান্ডা পানি দিয়ে পুরো মাথা ধুয়ে

ফেলা। এ কাজটা আপনার শরীরের রক্ত সঞ্চালনকে ভালোভাবে সক্রিয় করবে এবং শরীরে উদ্যম এনে দেবে।

যাদের সালাত ছুটে না, তাদের মাঝে আরেকটি বিষয় আমি লক্ষ করেছি। তারা খাবার খাওয়ার জন্য সালাতের আগের সময়টা নয়; বরং সালাতের পরের সময়টাকে নির্ধারণ করেন। এ দলের মানুষের কাছে মনে হয়, সালাতের আগে খাবার খেলে শরীর ভারী হবে এবং অলসতা আসবে, তাই তারা খাবারের জন্য সালাতের পরের সময়টাকে বেছে নেন। অন্যদিকে আরেক দলকে দেখেছি, ক্ষুধা নিয়ে তারা সুন্দর করে সালাত আদায় করতে পারেন না। তাই তারা সালাতের আগে খাবার খেয়ে শক্তি সঞ্চয় করে নেন। এ ক্ষেত্রে আপনার করণীয় হচ্ছে এ দুটো অবস্থা পরীক্ষা করে নিজের জন্য যেটা যথার্থ মনে হবে, সেটা গ্রহণ করা।

- দৈনন্দিন জীবনের যেসব ভুল আপনার ও সালাতের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করে, সেসব ভুল থেকে শিখুন।

- ভুলগুলো বিশ্লেষণ করুন এবং ভুলের পুনরাবৃত্তি থেকে বিরত থাকুন।

আপনার কোনো শক্তি নেই

আপনার শারীরিক ও মানসিক অবস্থা যেমনই হোক না কেন; ক্লান্তি, তন্দ্রা, আলস্য, খিদে যা-ই আপনি অনুভব করেন না কেন—আপনার কাজের পদক্ষেপ আপনার সবকিছু পুরোপুরি পাল্টে দিতে সক্ষম। মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, 'মানুষের নড়ন-চলন শরীরে শক্তির সঞ্চার করে।'

বসা থেকে উঠে অজুর জন্য চলে যাওয়া, চোখেমুখে পানির ছিটে লাগা, এরপর মসজিদের দিকে হাঁটা আপনার মাঝে এমন শক্তির সঞ্চার করবে, যার মাধ্যমে আপনার মস্তিষ্কের ঝিমুনি ভাব কিংবা শরীরের জড়তা দুটোই কেটে যাবে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে, অনেকে এই ভুল ধারণায় থাকে যে, যদি তারা সালাতে না যায়, তবে তারা আরাম ও সুখে থাকবে, তাদের নেতিবাচক চিন্তাভাবনা তাদের ওপর ছড়ি ঘুরানোর কারণে তাদের এ দুরবস্থা। সালাতের সময় হলেও তারা যেখানে বসে ছিল সেখানেই বসে থাকে এমনিই। তারা আফসোস করে যে, তাদের মানসিক অবস্থা খারাপ বা তারা ক্লান্তি অনুভব করছে বলে সালাতে যেতে পারছে না। অথচ এক পা আগালেই তাদের জন্য সব সহজ হয়ে যেত।

অজু

অজুর সময় আমাদের শরীরে বিরাট পরিবর্তন ঘটে। ঠান্ডা পানি যখন হাতে, পায়ে ও মুখে লাগে, তখন এসব অঙ্গের উষ্ণতা কমে যাওয়ার কারণে রক্তের ধমনী সংকুচিত হয়ে আসে। ফলে শরীরের অন্যান্য অঙ্গের তুলনায় এসব অঙ্গে রক্ত সঞ্চালন দ্রুত হয়। রক্তের এ সঞ্চালন এসব অঙ্গের স্নায়ুকে প্রাণবন্ত করে তোলে। এভাবে সর্বপ্রধান স্নায়ুও তথা মগজও প্রাণবন্ত হয়। আর অজুর মাধ্যমে মস্তিষ্কের এ প্রাণবন্ততায় মানুষও কর্মমুখর হয়ে ওঠে।

এ কারণেই অজ্ঞান মানুষের মাথায় ও মুখে ঠান্ডা পানির ছিটা দিলে তার জ্ঞান ফিরে আসে। ঠান্ডা পানির ছোঁয়া মস্তিষ্ককে এসব অঙ্গের মধ্যে রক্ত সঞ্চালনের গতি দ্রুত করে দেয়। যার ফলে অচেতন মানুষের চেতনা ফিরে আসে।

গবেষণায় দেখা গেছে, যারা দিনে কয়েকবার অজু করে, কুলি করে, নাকে পানি দেয়; অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের নাক জীবাণু থেকে পরিষ্কার থাকে। অন্যদিকে যারা অজু করে না, তাদের নাকে বিভিন্ন ধরনের হাজারো জীবাণুর চাষাবাদ হয়ে থাকে। অতএব বলা যায়, অজু আমাদের শ্বাসযন্ত্রে জীবাণু পৌঁছতে বাধা দেয় এবং নাককে বিভিন্ন ধরনের রোগ থেকে রক্ষা করে।

আরেকটা বাস্তবতা খেয়াল করি, অধিকাংশ মুসলিম দেশে তুলনামূলকভাবে গরমের তাপমাত্রা বেশি হওয়া সত্ত্বেও এসব দেশে স্কিন ক্যান্সার অনেক কম। কারণ ঘাম থেকে জন্ম নেওয়া ক্ষতিকর রাসায়নিক উপাদান চামড়ার ওপরে জমে বসার আগেই অজুর মাধ্যমে পরিষ্কার হয়ে যায়।

যখন সূর্যরশ্মি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ওপর পড়ে, তখন রঞ্জন রশ্মি ও অতি বেগুনি রশ্মি চুষে নেওয়ার কারণে বায়ুমণ্ডলে একটি স্তর বিদ্যুতায়িত হয়ে যায়। এ স্তরকে বলা হয় আইনস্পেয়ার বা আয়নমণ্ডল। বায়ুমণ্ডলের এ স্তর পৃথিবীর দিকে ইলেকক্ট্রিক চার্জ নিক্ষেপ করে। পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্টি এমনকি মানুষের ওপরও এ ইলেকক্ট্রিক চার্জ প্রভাব ফেলে।

ব্রিটেনের সাইন্স শো উপস্থাপক রিচার্ড হ্যামন্ডকে এ নিয়ে একটি ডকুমেন্টারি করতে দেখা যায়। প্রথমে একটি ছোট কাঠের ঘরে এক বালতি পেট্রল ছড়িয়ে

দেওয়া হলো। এরপর ঘরের ভেতর একটা তারের মাথা রেখে ঘরটা বন্ধ করে দেওয়া হলো।

যথেষ্ট দূরত্বে গিয়ে এক লোক পশমি কাপড় পরে একটি প্লাস্টিক কন্টেইনারের ভেতর দাঁড়াল (প্লাস্টিকের ভেতর দাঁড়ানোর বিশেষ কারণ আছে, সামনে এ বিষয়ে খোলাসা করব)। এরপর সে লোক তার শরীরের একটা অংশের সাথে আরেকটা অংশের চামড়া ঘষে নিল মিনিটকয়েক। এবার তারের অপর মাথা তার আঙুল দিয়ে ধরল। শব্দ করে সে কাঠের ঘরে আগুন জ্বলে উঠল।

মোটকথা, লোকটার শরীর থেকে ইলেকট্রিক স্পার্ক তৈরি হলো আর তারের মাধ্যমে সে বিদ্যুৎপ্রবাহ পেট্রল লাগানো ঘরে পৌছলে সেখানে আগুন ধরে গেল। এভাবে প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণিত হলো যে, মানুষের শরীর ইলেকট্রিক চার্জ বহন করে।

এ থেকে আমাদের মনে হতে পারে যে, 'আল্লাহ তাআলা যদি অজুতে শরীরের সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ধোয়ার নির্দেশ দিতেন, তাহলে আরও ভালো হতো, যাতে শরীরের প্রতিটি অঙ্গ থেকেই ক্ষতিকর ইলেকট্রিকপ্রবাহ বিদায় হতো। তা ছাড়া শরীরের এমন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অজুতে বাদ রয়েছে, যেখানে ঘাম বা ধুলার সম্ভাবনা আরও বেশি। কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে আদেশ তো এসেছে শরীরের বিশেষ কয়েকটি অঙ্গ ধৌত করতে হবে।' আসলে এ কয়টি অঙ্গ ধোয়ার ফলে ক্ষতিকর ইলেকট্রিক চার্জ দূর হয়ে শরীরে নবশক্তি সঞ্চারিত হয়, ফলে অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ধোয়ার দরকার হয় না।

অন্যদিকে পানি না পেলে তায়াম্মুম করার আদেশ এসেছে আল্লাহর পক্ষ থেকে। তায়াম্মুম হচ্ছে মাটি দিয়ে অথবা মাটিজাতীয় জিনিস যেমন : পাথর প্রভৃতি দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করা। পানির মাধ্যমে ধৌত করলে যেমন ক্ষতিকর ইলেকট্রিক চার্জ দূর হয়ে যায়, তেমনই মাটির সংস্পর্শে এলেও ক্ষতিকর ইলেকট্রিক চার্জ দূর হয়ে যায়। আর এ কারণেই পরীক্ষণটা করার সময় লোকটা প্লাস্টিক কন্টেইনারের ভেতরে ছিল; যেন মাটির সাথে তার সংস্পর্শ না থাকে। মাটির সাথে সংস্পর্শ থাকলে তার শরীর ঘষায় উৎপন্ন ইলেকট্রিকপ্রবাহ নিঃশেষ হয়ে যেত নিমিষে।

আশা করি অজুর প্রতি আপনার দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন এসেছে। অজু হচ্ছে শক্তির গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক উৎস। তাই যখন অলসতা, ক্লান্তি বা কোনো কিছু করার আগ্রহ না থাকে, তখন অজু করে নিন। এমনকি সালাতের ওয়াক্ত না হলেও কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ করার আগে অজু করে নিন।

প্রিয় নবি ﷺ বলেছেন :

'তোমাদের কেউ যখন পূর্ণরূপে অজু করে এই দোয়াটি পড়ে : (أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ) "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো শরিক নেই, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসুল"—তখন তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেওয়া হয়, সে আট দরজার যেকোনো একটি দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারে।'[৫১]

মসজিদে যাওয়া

ধরা যাক, আপনার বাড়ি থেকে মসজিদ পায়ে হেঁটে তিন মিনিটের দূরত্বে। তাহলে আসা-যাওয়ায় মোট ছয় মিনিট ব্যয় হবে। সুতরাং পুরো দিনে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতে ৩০ মিনিট যাবে। এবার আসুন প্রতিদিন ৩০ মিনিট হাঁটার কারণে আপনার জীবনের ওপর কী প্রভাব পড়ে, তা নিয়ে আলোচনা করি :

- অলসতা, জড়তা ও স্ট্রেস হচ্ছে শারীরিক অনুভূতির নাম। নড়ন-চলন বা হাঁটার মাধ্যমে আপনার শরীরের অবস্থায় পরিবর্তন আসবে, আপনার শরীরের বায়োকেমিস্ট্রিতে পরিবর্তন ঘটবে। গবেষণায় দেখা গেছে, হাঁটাচলার সময় মানুষের শ্বাস ফেলা ও শ্বাস গ্রহণ মানুষকে প্রফুল্ল করতে, শরীরের স্নায়ুকে শান্ত করতে ও মানসিক চাপ কমাতে বিরাট ভূমিকা রাখে।

- নিয়মিত হাঁটার মাধ্যমে অস্বাস্থ্যকর কোলেস্ট্রোল থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। শরীরের যে স্বাস্থ্যকর কোলেস্ট্রোলের প্রয়োজন পড়ে, সেটা বৃদ্ধি পায়। শরীরের স্বাভাবিক ওজন মেইন্টেইন করতে সহায়ক হয়। এটা শরীরের ফিটনেস ঠিক রাখতে সাহায্য করে। মন-মেজাজ ফুরফুরে রাখে।

---

৫১. সহিহু মুসলিম : ২৩৪।

- হাঁটার ফলে রক্তের মধ্যে ভিটামিন ডি বৃদ্ধি পায়। যার ফলে হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা কমে যায়।

- হাঁটার সময় শরীরের বড় বড় মাংসপেশীতে নড়াচড়া হয়। যেমন : উরুর মাংসপেশী, হাঁটুর বাটি, পায়ের নলা, পায়ের পাতা। শরীরের এসব অংশে নড়াচড়া হলে শরীরে ভালোভাবে রক্তের সার্কুলেশন হয়। অঙ্গপ্রত্যঙ্গে অক্সিজেন সরবরাহ ত্বরান্বিত হয়। হৃদয় ও ধমনীর সুষম রক্তপ্রবাহ নিশ্চিত হয়। হাড় সুস্থ থাকে। শরীরের স্থূলতা কমে। ডায়াবেটিকস হওয়ার আশঙ্কাও কমে যায়।

প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাতে ৩০ মিনিট হাঁটার ব্যায়াম আপনার শারীরিক সুস্থতা অনেক গুণ বাড়িয়ে দেবে। তেমনিভাবে এটা দিনব্যাপী শক্তি নবায়নের উৎস হিসেবে কাজ করবে। হাঁটাচলার ফলে জড়তা ও অবসাদ দূর হয়। তাই যখন সালাত আদায়ে অলসতা আসবে, তখন ভুলেও মনে করবেন না, সালাতে না গিয়ে বসে থাকলে আপনার অবসাদ কেটে যাবে। বরং তখন বসা থেকে উঠে মসজিদে যাওয়াই আপনার অবসাদ দূর করার সমাধান।

রুকু-সিজদা

আপনি দৈনিক অন্তত ১৭ বার সালাতে রুকু করেন, দৈনিক অন্তত ৩৪ বার সিজদা করেন। এ পৃথিবীতে মুসলিমরা ছাড়া আর কেউই প্রতিদিন নিয়মিত ও সুশৃঙ্খলভাবে এ রকম করে না।

মুসলিমদের সালাতের কিয়াম, রুকু ও সিজদা নিয়ে বিশেষ গবেষণা হয়েছে। ১৮৮ জন ব্যক্তির ওপর কৃত এ গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, নিয়মিত এভাবে সালাত আদায় করলে লোওয়ার ব্যাক পেইন ও স্পাইনাল ডিস্ক হার্নিশন নামের রোগ হওয়ার আশঙ্কা কমে যায়।

তেমনিভাবে বিশ্বের অনেক মেডিক্যাল সেন্টার ও ফিজিক্যাল থেরাপির বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠানের কাছে সালাতের বিশেষ উপকারিতা প্রমাণিত হয়েছে। তারা সালাতে দাঁড়ানো, রুকু করা, সিজদা করা প্রভৃতি মৌলিক কাজগুলোকে তাদের চিকিৎসা ও থেরাপির কাজে ব্যবহার করেছেন।

গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, প্রতিদিন কয়েকবার এসব কাজের পুনরাবৃত্তি করা মানুষকে সুস্থতার শিখরে পৌঁছে দেয়। ডাক্তারি পরিভাষায় যাকে বলে হাই ফিটনেস।

অতিরিক্ত ওজন, ডায়াবেটিকস ও শরীরের বায়োলজিক্যাল কার্যাবলি সুশৃঙ্খল রাখার ক্ষেত্রে সহায়তা করে সালাত। শরীরের অনেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আরও বহু উপকার করে যেমন : মুখমণ্ডল, চোখ, মুখগহ্বর, জিহ্বা, পেট ও অন্ত্রের অভ্যন্তরীণ পেশীগুলোর উপকার করে, ফুসফুসের শক্তি বৃদ্ধি করে।

এ গবেষণা আরও বলে যে, লোওয়ার ব্যাক পেইন (পিঠের নিচের ব্যথা) বয়স্কদের মধ্যে সর্বজনীন সমস্যায় রূপ নিয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ রোগের কারণ হিসেবে দেখা গেছে শরীরের পশ্চাদ্‌বর্তী লম্বা অস্থি সন্ধিবন্ধনী (posterior longitudinal ligament)'র নমনীয়তা না থাকা। এদিকে পা সোজা রেখে পিঠকে সামনের দিকে ঝুঁকালে, সহজ ভাষায় রুকু করলে শরীরের পশ্চাদ্‌বর্তী লম্বা অস্থি সন্ধিবন্ধনী (posterior longitudinal ligament)'র নমনীয়তা বৃদ্ধি পায় এবং লোওয়ার ব্যাক পেইন হওয়ার আশঙ্কাও অনেকটা কমে যায়।

তেমনিভাবে সালাত পুরো শরীরের ছোট-বড় সব অস্থিসন্ধির সুষম এবং নিরাপদ সঞ্চালন নিশ্চিত করে। সাথে সাথে শরীরকে দৈনন্দিন কাজের ধকল সহ্য করতে প্রস্তুত করে।

সিজদায় গেলে মাথায় রক্ত সঞ্চালন আরও ভালো হয়। ফলে মস্তিষ্কের তারগুলো বেশি পরিমাণে সক্রিয় হয়ে ওঠে। তাই বৃদ্ধ মানুষও তার ব্রেইন পাওয়ারকে ভালোভাবে কাজে লাগাতে পারে।

সিজদা হজম প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করে। উরুর সাথে পেটের সংস্পর্শ ও চাপ লাগার কারণে এক ধরনের সেল্ফ ম্যাসাজ হয়ে যায়, যার ফলে এবডোমিন্যাল ওয়াল, লিভার ও প্যানক্রিয়াস (pancreas) শক্তিশালী হয়। যা অন্ত্রের কার্যপ্রক্রিয়া আরও ক্রিয়াশীল করে এবং পিত্তথলির রস নিঃসরণ বাড়ায়। এভাবে হজমের অবস্থা আরও ভালো হয় এবং কোষ্ঠকাঠিন্য হ্রাস পায়। পেটের ও নিতম্বের দিকে চর্বি জমা হওয়ার হার কমে যায়। তাই সিজদাকে যোগ-

ব্যায়ামের সবচেয়ে বড় ও চমৎকার ব্যায়াম হিসেবে গণনা করা হয়। সিজদা থেকেই যোগ-ব্যায়ামের গুরুত্বপূর্ণ অংশের উদ্ভাবন হয়েছে।

দিনে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতে অনেক বারই হাঁটু পেতে তাশাহুদের বৈঠকে বসতে হয়। এ বৈঠকের সময় উভয় হাঁটুকে সম্পূর্ণ বাঁকিয়ে নিতে হয়। সাথে সাথে পুরো শরীরের ভার এসে পড়ে পশ্চাৎদেশে, যা এসে চাপ দেয় পায়ের শেষাংশের পুরোটার ওপরে। এই সময় পায়ের গোড়ালি পশ্চাৎদেশের সাথে লেপ্টে যায়। এ রকম বৈঠকের ফলে শিরা ও ধমনী ব্লাড কনজেশন (রক্ত জমাটবদ্ধতা) থেকে মুক্ত হয়ে রক্তপ্রবাহ বেড়ে যায়। তাই তাশাহুদের বৈঠক পায়ের নিচের অংশের শিরা ও ধমনীর রক্ত জমাটবদ্ধতা কাটাতে সবচেয়ে উপকারী ব্যায়াম হিসেবে প্রমাণিত।

তাশাহুদের পর বৈঠকের অন্যান্য কাজ শেষ করে মুসলিম ডানে-বামে ঘাড় ঘুরিয়ে সালাম দিয়ে সালাত শেষ করে। এ ছোট কাজটা সালাত আদায়কারী ছাড়া অন্যদের মাঝে বিরল। যারা সালাত আদায় করে না, তারা এ ছোট্ট ব্যায়ামটা থেকে বঞ্চিত হয়। দিনে অন্তত পাঁচবার এ ব্যায়ামটা করা ঘাড়ের মাংসপেশী, সার্ভিক্যাল স্পাইন ও লিগামেন্ট (ঘাড়ের ভেতরের হাড়)-এর জন্য যথেষ্ট উপকারী। এ ছোট ব্যায়ামটার মাধ্যমে ঘাড় আরও বেশি শক্তিশালী ও নমনীয় হয়, ফলে ঘাড় শক্ত হওয়া রোগ থেকে মুক্ত থাকা যায়। ঘাড় শক্ত হতে থাকলে একসময় স্পাইনাল ডিস্ক হার্নিশন রোগটি হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

সালাত মানুষকে আকস্মিক ঘটে যাওয়া ঘটনার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে সাহায্য করে। যেমনটা অনেকের ক্ষেত্রে ঘটে, কেউ দীর্ঘ সময় ধরে বসে থাকলে কখনো কখনো তার ব্লাড প্রেশার লো হয়ে যায়, আবার কেউ কেউ অজ্ঞান হয়ে পড়ে। কিন্তু যারা নিয়মিত সালাত আদায় করে, তাদের ক্ষেত্রে এ রকম ঘটনা বিরল। একইভাবে যারা নিয়মিত সালাত আদায় করে, তারা বমির ভাব হওয়া বা মাথা ঘুরানোর সমস্যায়ও তেমন ভোগেন না।

পরে পড়ব পড়ব করে এ রকম কত সালাত ছুটে গেছে!? আপনি নিজেকে বুঝিয়েছিলেন পরে পড়ব, এরপর সে পরের সময়টা এলেও তখন দেখলেন, সালাত আদায় করা তখন বেশ কঠিন ও ভারী হয়ে উঠেছে আপনার ওপর। এভাবে কত সালাত যে ছুটে যায়!

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ওয়াক্তমতো সালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। যে ব্যক্তি সালাতকে পিছিয়ে দেয়, তাদের ব্যাপারে বলেছেন :

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ - الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ

> 'অতএব দুর্ভোগ সেসব সালাত আদায়কারীর জন্য, যারা নিজেদের সালাতের ব্যাপারে উদাসীন।'[৫২]

আল্লাহ তাআলা এখানে বলেননি যে, 'যারা নিজেদের সালাতের মধ্যে উদাসীন'; বরং এখানে বলেছেন, 'যারা নিজেদের সালাতের ব্যাপারে উদাসীন।' অর্থাৎ এখানে উদাসীনতা হচ্ছে সালাতকে পিছিয়ে দিয়ে সালাতের ব্যাপারে এমনভাবে উদাসীন থাকা যে, পরবর্তী সালাতের ওয়াক্ত এসে যায়। মোটকথা, এ আয়াত দুটিতে ফরজ সালাতকে ওয়াক্তের ভেতর আদায় করার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

জার্মান প্রফেসর কিনিউট পাইফার কিছু প্রযুক্তি সামনে নিয়ে আসেন। এসব প্রযুক্তির মাধ্যমে কোনো জায়গার উপস্থিত পাওয়ার রেডিয়েশন, বিশেষ করে মানুষের শরীরের পাওয়ার রেডিয়েশন নির্ণয় করা যায়। এ যন্ত্র নিয়ে মুসলিমদের সালাতের ওপর বিশেষ গবেষণা হলো। তখন একটা আশ্চর্যকর বিষয় সামনে এল যে, সালাত আদায়কারী সালাতের খুশুর মাধ্যমে বিরাট পরিমাণে আত্মিক শক্তি লাভ করে। এ বিষয়টা বের হয়ে এসেছে, যখন সালাতের আগে ও পরে সালাত আদায়কারীর শরীর থেকে নির্গত পাওয়ার রেডিয়েশন লেভেল দেখা হলো।

---

৫২. সুরা আল-মাউন, ১০৭ : ৪-৫।

বিষয়টা আমরা এভাবে ধরতে পারি যে, মুসলিমরা দিন-রাতে পাঁচবার সালাত আদায় করে। পাঁচ ওয়াক্ত সালাত মুসলিমদের আত্মিক শক্তিকে চার্জ করে পুরো দিনের জন্য প্রস্তুত রাখে। এভাবে নিয়মিত বিরতিতে সরবরাহ হতে থাকে। সালাত মুসলিমদের ভেতরটা প্রশান্তিতে ভরপুর করে দেয়, নফসকে পরিষ্কার করে ক্লান্তি ও দৈনন্দিন জীবনের কাজের জন্য প্রস্তুত করে। যেমনই জনৈক নেককার বলেছেন, 'মনের ভেতর দুনিয়া বড় হতে থাকে, বড় হতে থাকে, বড় হতেই থাকে; এরপর সালাত এসে দুনিয়াকে তার আপন স্থানে ফিরিয়ে দেয়।'

আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে, সালাতের ওয়াক্তসমূহে এ শক্তির হার বৃদ্ধি পেতে পেতে সালাতের সময় তা শিখরে উঠে যায়। আজানের সময় থেকে শুরু হয় এ বৃদ্ধি। সবশেষে সালাতের সময় তা পূর্ণতা পেয়ে সর্বোচ্চ হয়। এরপর সালাত আদায় করে যাওয়ার পর ধীরে ধীরে নামতে থাকে পরবর্তী সালাতের ওয়াক্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত। পরবর্তী ওয়াক্ত এলে তখন আবার ধীরে ধীরে শক্তির হার বাড়তে থাকে। সালাতের ওয়াক্তের সাথে মানুষের শরীরের হরমোনের বিশেষ সম্পর্ক পাওয়া গেছে। সালাতের বিবিধ ওয়াক্তের সময় শরীর এসব হরমোন নিঃসরণ করে।

এ জন্য যখন সালাত ছুটে যায়, তখন সালাত ছুটে যাওয়ার কারণে একটা ভারী বোঝা অনুভব করি আমরা। এ ক্ষেত্রে সমাধান হচ্ছে সালাতের ওয়াক্তের সময় যখন শক্তির হার বাড়তে থাকে, তখনই সুযোগ কাজে লাগিয়ে সালাত আদায় করে ফেলা। যাদের সালাত ছুটে না, তাদের এ সফলতার রহস্য এটাই যে, আজান হওয়ার সাথে সাথে সালাতের প্রথম ওয়াক্তেই সালাত আদায়ে তারা উৎসুক থাকে।

সালাতের ওয়াক্ত নির্ধারিত। সালাতের এ সময়টার মধ্যে যে উচ্চ শক্তি রয়েছে এবং যেটা আপনাকে সহজে সালাতের পাবন্দ হতে উৎসাহিত করে, সেটাকে কাজে লাগান। শয়তান আপনাকে ধোঁকা দেবে, আপনি তার দেওয়া কোনো অজুহাতের ধার ধারবেন না। যেমন সে বলতে পারে, আখেরি ওয়াক্তে সালাত আদায় করলেও তো হয় ইত্যাদি ইত্যাদি। এসব হচ্ছে আজানের সময় শয়তানের ছুটে পালানোর আগ মুহূর্তে দেওয়া শেষ মরণকামড়।

প্রিয় নবি ﷺ বলেন :

'যখন সালাতের আজান শুরু হয়, তখন শয়তান তার পেছনে হাওয়া ছাড়তে ছাড়তে পালাতে থাকে, যেন তাকে আজান শুনতে না হয়। আজান শেষ হয়ে গেলে সে আবার ফিরে আসে।'[৫৩]

শয়তান আজানের সময়টাতে আপনার কাছে থাকতে পারে না। তাই শয়তান আজানের আগ মুহূর্তে তার সর্বশেষ অস্ত্রটা ব্যবহার করে যায় যে, যেন আপনি সালাত বিলম্বিত করেন, আজানের সাথে সাথে সালাতের জন্য বের না হয়ে পড়েন, যেন আজান শেষে সে আবার এসে আপনার ওপর তার ওয়াসওয়াসার কামান দাগাতে পারে। এখন তো বিষয়টা স্পষ্ট হয়ে গেছে। অতএব আজানের সাথে সাথে সালাতের উদ্দেশ্যে উঠে পড়ুন এবং সব সময় এর ওপর অটল থাকুন।

ছোট ছোট অভ্যাস

আমাদের জীবন কিছু ছোট ছোট দৈনন্দিন অভ্যাসের সমষ্টি। আমরা প্রতিদিন যেসব ছোট ছোট অভ্যাসের চর্চা করি, সেসব অভ্যাস হয় বড় কোনো সফলতা এনে দেয় অথবা এমন কোনো ভয়ংকর বিপর্যয়ের দিকে ধাবিত করে—যে বিপর্যয় সহ্য করা আমাদের ক্ষমতার বাইরে।

যারা অতিরিক্ত ওজন ও তৎসংশ্লিষ্ট রোগে ভুগছেন, তাদের এ রোগ রাতারাতি হয়ে যায়নি। এ রোগ হয়েছে ছোট ছোট ক্ষতিকর অভ্যাসের স্তূপ থেকে এবং ছোট ছোট উপকারী অভ্যাসকে উপেক্ষা করার কারণে। অবশেষে এমন একটি দিন আমাদের সামনে এল, যে দিনটায় আমাদের এতদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষতির সংশোধন করতে আমাদের বিরাট কষ্ট করতে হচ্ছে।

একইভাবে ডিপ্রেশন নামের রোগটা একদিনে সৃষ্টি হয়নি। বরং এটিও দৈনন্দিন ক্ষতিকর অভ্যাসগুলোর সমষ্টি। কিন্তু রোগী তো সেসবকে তুচ্ছ ভেবেছে। অবশেষে এমন একটি দিন এল, যেদিন এ কৃতকর্মের ভার সামলানো তার

৫৩. সহিহুল বুখারি : ১২৩১।

জন্য কঠিন হয়ে দেখা দিল। এরপর জীবনের প্রতিও অনীহ হয়ে পড়ল সে। অবশেষে তার কৃতকর্মের বোঝা তাকে আত্মহত্যা পর্যন্ত নিয়ে গেল।

অন্যদিকে দৈনন্দিন জীবনের ছোট ছোট উপকারী অভ্যাস আমাদের বড় সফলতা অর্জনে সাহায্য করে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার মহা প্রজ্ঞার একটি নিদর্শন হচ্ছে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত। তিনি দিনে-রাতে মোট পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আমাদের ওপর ফরজ করেছেন। দেখুন, সালাতসংশ্লিষ্ট ছোট ছোট কাজ যেমন : অজু, মসজিদের দিকে হেঁটে যাওয়া, সালাতের ভেতরের কর্মসমূহের বিরাট ও সুদূরপ্রসারী সুফল রয়েছে আমাদের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার ওপর।

মসজিদে এ রকম কত বুড়ো মানুষ দেখেছি, যাদের বয়স ৮০-৯০ পেরিয়ে গেছে। বার্ধক্য সত্ত্বেও এখনো তাদের বুঝ-বুদ্ধি সংরক্ষিত। তারা এ বয়সেও সালাত ত্যাগকারী বৃদ্ধদের তুলনায় বেশি সুস্থ। কারণ তারা যৌবনের শক্তিমত্তার সময় সালাতের পাবন্দ ছিলেন। এখন সালাত বার্ধক্য ও দুর্বলতার সময় তাদের সুস্থ ও সংরক্ষিত রেখেছে।

মজার ব্যাপার হচ্ছে, তার ছেলে-মেয়েরা বিয়ে করে সংসার পেতেছে, তার বন্ধুবান্ধব ওপারে পাড়ি জমিয়েছে, এখনো সালাত তার জীবনের বন্ধু হয়ে রয়েছে। যারা তাদের প্রবল ব্যস্ততা ও প্রিয়জনদের সমাগমের সময়েও সালাতকে সময় দিয়েছে, সালাত বৃদ্ধ বয়সে তাদের হাত ধরেছে, সঙ্গ দিয়েছে, পুরস্কৃত করেছে, তাদের জীবনের ক্লান্তি লাঘব করেছে। প্রায় সব মানুষই বৃদ্ধ বয়সে নির্জীব হয়ে পড়েন, কিন্তু সালাতময় জীবনের অধিকারী বৃদ্ধ কখনোই তার সজীবতা হারান না। সালাত তাকে ঘিরে রাখে, সান্ত্বনা দেয়, স্বপ্ন দেখায়, তার দুচোখের আলো হয়ে জেগে থাকে।

যে বৃদ্ধ মানুষটা পাঁচ ওয়াক্ত সালাতে মসজিদে যাওয়া-আসা করেন, তিনি কী করে একাকিত্ব বা বিরক্তি অনুভব করতে পারেন?! অথবা যে বৃদ্ধা সালাতের সময়টাতে গৃহস্থালি কাজের মাঝে ঘরময় ঘুরে বেড়ায় অথবা নাতি-নাতনির তত্ত্বাবধায়নে নিয়োজিত থাকেন, তিনি কী করে বিরক্তি বা একঘেয়েমি অনুভব করতে পারেন?!

যে ব্যক্তি যৌবনে তার ব্যস্ততার মুহূর্তে ও প্রিয়জনদের সমাগমের সময় সালাতের পাবন্দি করেননি, বৃদ্ধ বয়সে তিনি সালাতের পাবন্দি করবেন আর সালাত তার একাকিত্ব দূর করবে—এমন ভুল ধারণা মনের মাঝে জায়গা দেবেন না। কথায় আছে, যেমন কর্ম তেমন ফল। আপনি যা রোপণ করবেন, তা-ই কাটবেন। সালাত ত্যাগকারী যা রোপণ করেনি, তার ফসল কীভাবে ঘরে তুলবে?!

সালাত শক্তি। এ ভুল ধারণা করবেন না যে, সালাত আপনার শক্তি আরও কমিয়ে দেবে। ভুল ধারণা করবেন না যে, সালাত পড়তে যাওয়া মানে আরেকটি কাজ করে ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসা। বরং সালাতই হচ্ছে শক্তির উৎস। সালাত আপনার শক্তিতে ক্ষয় ধরাবে না। বরং সালাত আদায় করলে আপনার শক্তি ও সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

এ ভুল ধারণাও করবেন না যে, সালাত আদায় না করে এমনিই বসে থাকলে আপনার অলসতা-অবসাদ কেটে যাবে। বরং সালাতের জন্য উঠে যাওয়াই আপনার অলসতা-অবসাদ দূর হওয়ার কৌশল। সালাতের আগে যেমন ক্লান্তি বা অবসাদেই ভুগেন না কেন, সালাত আপনার সব সমস্যার সমাধান করবে। সালাত আপনাকে ইতিবাচক শক্তি দিয়ে আপনার কাজে সহায়তা করবে এবং আপনাকে প্রাণবন্ত করবে।

সালাতে অবিচল থাকুন

সালাতে অবিচল থাকুন...

মহাপ্রজ্ঞাবান মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয়তম নবি ﷺ-এর প্রতি এ আদেশটি করেছেন। যিনি রাতের বেলা নফল সালাত পড়তে পড়তে পা ফুলিয়ে ফেলতেন। ফরজ সালাত ছিল যার জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ফরজ সালাত যার অস্তিত্বের সাথে মিশে গিয়েছিল। সমস্ত সৃষ্টি থেকে যাকে নির্বাচন করা হয়েছে ফরজ সালাতের আদেশ মানবজাতির কাছে পৌঁছে দিতে।

আপনি জানেন কি, কেন আল্লাহ তাআলা সালাতের আদেশ পৌঁছে দেওয়ার জন্য এ রকম আদেশ করলেন? কেন বললেন 'সালাতে অবিচল থাকুন'?

মহান আল্লাহ কি আমাদের নবি ﷺ-এর মধ্যে সালাতের প্রতি অবহেলার কিছু দেখেছেন, যে কারণে তিনি আদেশের মোড়কে এ উপদেশ প্রেরণ করলেন, বললেন, 'সালাতে অবিচল থাকুন'?

অবশ্যই না। তাঁর মধ্যে অবহেলার কিছুই ছিল না।

কেনই বা থাকবে? সালাত তো ছিল তাঁর চোখের শীতলতা, সালাত তো ছিল তাঁর প্রশান্তি...

কেনই বা থাকবে? তিনি তো প্রতি ওয়াক্তে ফরজ, সুন্নাত, নফল সালাত আদায় করতেন...

সফরে, বাড়িতে... ঘুমানোর আগে, ঘুম থেকে উঠে... সর্বদা সালাতই ছিল তাঁর সঙ্গী।

কৃতজ্ঞতা আদায়ের জন্য সালাত... ধৈর্যধারণের সময়ে সালাত... সালাত তাঁর আনন্দের সঙ্গী... সালাত তাঁর দুঃখের উপশম... সুখে সালাত... দুঃখে সালাত... তাহলে কেন আল্লাহ তাআলা আদেশ করলেন—'সালাতে অবিচল থাকুন।'

এখানে সালাতে অটল থাকার মর্ম হলো, সালাতের পরিণাম ও ফলাফলের ওপর অবিচল থাকা।

সালাত একজন মুসলিমের জীবনে সবচেয়ে বেশি পুনারাবৃত্ত হয় এমন একটি আমল।

আল্লাহ তাআলা এটিকে মুসলিমের জীবন পরিবর্তনের মাধ্যম বানিয়ে দিয়েছেন। এ কাজটি করলে মুসলিমের জীবনের অবস্থায় পরিবর্তন আসে, তার ভাবনার স্রোত ঘুরে যায়। কিন্তু এ পরিবর্তন রাতারাতি হয়ে যায় না। এ জন্যই আদেশ এসেছে, 'সালাতে অবিচল থাকুন।'

'সালাতে অবিচল থাকুন' এ আয়াতটি সেসব আয়াতের মধ্যমণি হয়ে সমুজ্জ্বল হয়ে আছে, যে সকল আয়াতে ইসলাম ও ইমানের বাণী প্রতিষ্ঠার মতো মহান উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য অটল-অবিচল থাকার কথা বলা হয়েছে; যে সকল আয়াতে সমালোচকদের বিরূপ কথায় এবং শত্রুদের চক্রান্তে হতাশ না হওয়ার উপদেশ এসেছে।

فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى - وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى - وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى

'কাজেই তারা যা বলছে, তাতে আপনি ধৈর্যধারণ করুন এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে আপনার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন। তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন রাতের বেলায় ও দিনের প্রান্তগুলোয়, যাতে আপনি সন্তুষ্ট হতে পারেন। আপনি আপনার চক্ষুদ্বয় কখনো প্রসারিত করবেন না ওই সবের প্রতি, যা আমি তাদের বিভিন্ন শ্রেণিকে পার্থিব জীবনের সৌন্দর্যস্বরূপ উপভোগের উপকরণ হিসেবে দিয়েছি তদ্বারা তাদের পরীক্ষা করার জন্য। আপনার রবের দেওয়া জীবনোপকরণ উৎকৃষ্ট ও অধিক স্থায়ী। আর আপনার পবিরার-পরিজনকে সালাতের নির্দেশ দিন আর তাতে অবিচল থাকুন। আপনার কাছে আমি রিজিক চাই না, আমিই আপনাকে রিজিক দিয়ে থাকি, উত্তম পরিণাম মুত্তাকিদের জন্য।'[৫৪]

পৃথিবীতে মানবজাতি প্রেরণের যে মহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, তা বাস্তবায়নের জন্য সালাত যেন অনুশীলন ও চর্চার ময়দান। আর সে মহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো, ইমানের দাওয়াহর বিস্তার। এ লক্ষ্য সফল করতে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানব নবিজি ﷺ কঠোর পরিশ্রম করেছেন, যার মালিকানায় দুনিয়ার বস্তুগত উপাদানসমূহ ছিল না, ছিল কেবল আল্লাহর পথের অটলতা আর অবিচলতা। আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে একাই অটল ও অবিচলতার সাথে দাওয়াতের পথে বেরিয়ে পড়েছিলেন তিনি। মোকাবিলা হলো সবচেয়ে কঠিন ও শক্ত মানুষদের সাথে। কেবল এতটুকুই নয়, তাঁকে পৃথিবীর ভোগবিলাসের যাবতীয় আয়োজনের প্রলোভন দেখানো হলো; কিন্তু তিনি সেসবের প্রতি ভ্রুক্ষেপও করলেন না। তিনি ইসলামের দাওয়াতের ওপর অটল থাকলেন। তাঁর জীবনে নানা কষ্ট-নির্যাতন আসলো, তাঁকে শিআবে আবু তালিবে অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশায় কয়েক বছর কাটাতে হলো, কিন্তু তিনি ইসলামের দাওয়াতের ওপর অটল থাকলেন।

নবিজি ﷺ তাঁর লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হলেন অটল ও অবিচল থেকে। এমনকি তাঁর দাওয়াতের সামনে উমর বিন খাত্তাব আর খালিদ বিন ওয়ালিদের মতো কঠিন ও জেদি লোকেরাও নিজেদের সঁপে দিলেন। অটলতা ও অবিচলতা নবিজি ﷺ-এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অবশেষে তিনি মক্কা বিজয় করলেন।

---

৫৪. সুরা ত্বহা, ২০ : ১৩০-১৩২।

ন্যাপোলিয়ান হিল

ন্যাপোলিয়ান হিল বিখ্যাত আমেরিকান লেখক। বর্তমানে এমন কোনো সফল উদ্যোক্তা পাবেন না, যে এ লেখকের বই পড়েনি। তার বিখ্যাত বই Think & Grow Rich ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত হয়। এখনো এ বইটির কাটতি চলছে বাজারে। পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি বিক্রিত বইগুলোর তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে এটি।

নেপোলিয়ান ২৫ বছরেরও বেশি সময় এ বইটি লেখার কাজে ব্যয় করেছেন। তিনি গবেষণা করতেন, নোট নিতেন, তথ্য জোগাড় করতেন, বিবিধ চিন্তা তুলে আনতেন সফল ব্যবসায়ীদের সাক্ষাৎকার নিয়ে। তিনি ৪০ জন মিলিওনিয়ারের সাথে সাক্ষাৎ করেন। একেকজন একেক ফিল্ডের মিলিওনিয়ার। নেপোলিয়ান সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলা এসব মানুষের মধ্যে কমন লিংক ও কমন পয়েন্টগুলো জানার চেষ্টা করলেন।

বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে স্কটিশ বিলিওনার এন্ড্রু কার্নেগি তরুণ সাংবাদিক নেপোলিয়ান হিলকে একটা বড় সংখ্যক মিলিওনারের সাক্ষাৎকার নিতে বলেন। যাদের মধ্যে সবার আগে সাক্ষাৎকার হবে স্বয়ং এন্ড্রু কার্নেগির। তাদের সাফল্যের নেপথ্য কারণ জানা ও তা বই আকারে প্রকাশ করার পরামর্শ দেন তিনি। কারণ এ তালিকার এসব ব্যবসায়ী স্রেফ ভাগ্যের জোরে ধনী নন; বরং তারা শূন্য থেকে শুরু করে কষ্ট-পরিশ্রমের পরে ধনী হয়েছিলেন।

এরপর নেপোলিয়ান নির্বাচিত সমকালীন সফল ব্যক্তিত্ব ও মিলিওনিয়ারদের সাথে দেখা করতে যান। বিখ্যাত গাড়ি কোম্পানি ফোর্ডের মালিক হেনরি ফোর্ড, স্টিল ম্যাগনেট চার্লজ শোয়াব, সে যুগের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি জন রক ফেলার, তৎকালীন আমেরিকান প্রেসিডেন্ট থিওডর রুজভেল্ট, হাজার আবিষ্কারের জনক হিসেবে খ্যাত টমাস আলভা এডিসনের মতো ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার নেন। তাদের অর্থ-প্রাচুর্য নিয়ে তাদের অভিমত ও স্বপ্নের বিবরণ নিয়ে আসেন তিনি। তাদের পরিশ্রম ও সফলতার কথা, তাদের ব্যক্তিত্ব গঠনের পরিকল্পনা নিয়ে সাজিয়ে তুলেন বইটি। নেপোলিয়ান তার এ বইতে

এসব ব্যক্তিদের এতটা ধনী হওয়ার মূল রহস্য ও মৌলিক কথাগুলো তুলে ধরেন বিন্যস্ত আকারে।

নেপোলিয়ান বইয়ের নবম অধ্যায়ে উল্লেখ করেন, সফলতার জন্য মৌলিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অটল-অবিচল থাকা। আসলেই এসব মিলিওনিয়ারদের মধ্যে এটি ছিল একটি কমন বৈশিষ্ট্য। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, নেপোলিয়ান অটল-অবিচলতার উদাহরণ দিতে গিয়ে প্রিয় নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর নাম উল্লেখ করেন। একটি বিশেষ পরিচ্ছেদ রচনা করেন তাঁকে নিয়ে। এ পরিচ্ছেদটির নাম দেন :

The Last Great Prophet (সর্বশেষ মহান নবি)।

এ পরিচ্ছেদে তিনি বর্ণনা করেন, কীভাবে নবি ﷺ মানবজাতির মধ্যে পরিবর্তন এনেছেন; যদিও তাঁর কাছে সে যুগের প্রচলিত শিক্ষাও ছিল না। তিনি মুজিজাকেও রিসালাত প্রসারের উপকরণ হিসেবেও ব্যবহার করেননি; যেমনটা তাঁর পূর্বের অন্য নবিদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে। আবার তিনি ধনীও ছিলেন না, ক্ষমতা-প্রভাব প্রতিপত্তিরও অধিকারীও ছিলেন না। কিন্তু তা সত্ত্বেও অল্প কয়েক বছরের মধ্যে জাজিরাতুল আরব তাঁর রিসালাতের সামনে আত্মসমর্পণ করল। এসবই সম্ভব হয়েছে লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে ও দাওয়াহ পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর ধৈর্য ও অবিচলতার ফলে।

ধৈর্য ও অবিচলতার গুণটিই আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসুলের ব্যক্তিত্বে গেঁড়ে দিয়েছেন, যাতে তিনি লক্ষ্য পূরণে সক্ষম হন। সালাত এসেছে এমন একটি দৈনন্দিন অনুশীলন হিসেবে, যা ধৈর্য ও অবিচলতার বৈশিষ্ট্যটি অন্তরে গেঁথে দেবে।

তাই কুরআনে এসেছে, 'সালাতে অবিচল থাকুন।' কারণ সালাতের ফসল রাতারাতি ঘরে তোলা যায় না। নবিজি ﷺ বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হওয়ার সময় সালাতের ফল পেয়েছেন। প্রতিটি ক্ষেত্রে সালাতই ছিল ধৈর্য ও অবিচলতা অবলম্বনের ক্ষেত্রে তাঁর সহযোগী। অবশেষে তাঁর সামনে প্রতিটি বাধা ভূপাতিত হলো আর প্রতিটি বিপত্তি নিষ্পত্তি হলো।

ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠা

সালাত প্রতিষ্ঠার একটি উদ্দেশ্য হচ্ছে, ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠা। সালাত প্রতিদিন অল্প অল্প প্রভাব ফেলে একজন সালাত আদায়কারীর ভেতরে আর সময়ের সাথে সাথে তাকে একদম নতুন একজন মানুষে পরিণত করে।

এ অর্থে সালাত হচ্ছে নফসের জন্য একটি প্রশিক্ষণ কোর্সের মতো, যে কোর্স পুরো জীবন চালু থাকে। যদি আপনার জীবনকে ঠিকভাবে গড়ে তুলতে চান, তবে প্রতিদিন পাঁচবার সালাত আদায়ে অটল থাকুন। সালাত আদায়ে মনোযোগী হন, খুশু-খুজুর সাথে সালাত আদায় করুন।

একদিন এক বডি বিল্ডারের সাথে কথা বলছিলাম। তাকে তার ব্যায়াম প্রভৃতি সম্পর্কে প্রশ্ন করছিলাম। জানতে চাইলাম, কীসব ব্যায়াম করে সে তার শরীরকে এভাবে পরিবর্তন করতে পেরেছে, কীভাবে তার কাঁধ এতটা চওড়া আর কোমর ও পেটের অংশ এতটা স্লিম হয়েছে। তিনি আমাকে কিছু ব্যায়াম সম্পর্কে জানালেন। অধিকাংশ ব্যায়াম সম্পর্কে আমি আগে থেকেই জানতাম। কিন্তু আলোচনার শেষাংশে তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যও যোগ করলেন।

বললেন, 'যারা নিজেদের শরীরকে ফিট করতে চায়, তাদের অনেকেই একটি বিষয়ে উদাসীন থাকে। আর সেটি হচ্ছে, সময়।' হ্যাঁ, তিনি আমাকে জানালেন, এ রকম নিখুঁত শরীর পেতে হলে বছরের পর বছর ধরে নিয়মিত ট্রেইনিং প্রয়োজন।

যেমনই শরীরের অবস্থা পরিবর্তন করতে হলে কয়েক বছরের ধৈর্য ও প্রশিক্ষণের প্রয়োজন, তেমনই ব্যক্তিত্বকে পরিবর্তন করতে হলে, আচার-আচরণে পরিবর্তন আনতে হলে, ভিন্ন ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হলে ধৈর্য ও প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। এখানেই আসে সালাতের ভূমিকা। সালাত আদায় করুন আর সালাতে অটল থাকুন।

উমর বিন খাত্তাব ﵁-এর দুটি বিপরীতধর্মী ঘটনা মনে পড়ছে। একটি ঘটনা তাঁর ইসলাম গ্রহণের আগের, আরেকটি ঘটনা ইসলাম গ্রহণের পরের।

প্রথম দৃশ্য আমাদের সামনে উমর ﷺ-এর কঠিন ব্যক্তিত্ব ও কঠোর স্বভাব তুলে ধরে। এ ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন দেখি তাঁর বোনের ইসলাম গ্রহণের পর বোনের সাথে ঝগড়ায় জড়ানো, বোনকে মারধর করে মুখমণ্ডল রক্তাক্ত করে দেওয়ার মাঝে।

সে সময় উমর না ছিলেন কোনো আমির না কোনো প্রধান। তাই এভাবে নিজ বোনের ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার কোনো অধিকারই তাঁর ছিল না। তা ছাড়া এ ঘটনা তাঁর বোনের বাড়িতে দু-তিনজন মানুষের চোখের সামনে ঘটেছিল।

দ্বিতীয় দৃশ্যে অর্ধজাহানের অধিপতি আমিরুল মুমিনিন উমর ﷺ মিম্বারে দাঁড়িয়ে মুসলিমদের উদ্দেশে খুতবা দিচ্ছেন মহিলাদের মোহরের মাসআলা সম্পর্কে। হঠাৎ করে সকলের সামনে এক নারী দাঁড়িয়ে আমিরুল মুমিনিনের কথা কেটে তাঁকে তাঁর সিদ্ধান্ত ঠিক করে নিতে বললেন।

উমর ফারুক ﷺ সে নারীকে না ধমক দিলেন, না কঠিন কোনো কথা বললেন। যদিও খতিবের কথা কেটে কথা বলা আদব নয়, জায়িজ নয়। উমর ﷺ চাইলে তাকে চুপ করিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি সকল মুসলিমের সামনে বললেন, 'এ নারী সঠিক বলেছে, উমর ভুল করেছে। সব মানুষ তোমার চেয়ে অধিক বিচক্ষণ, হে উমর।'

উভয় দৃশ্য তুলনা করলে আমরা 'সালাতে অবিচল থাকুন'-এর ফল দেখতে পাচ্ছি স্পষ্ট। যদি সালাত দিনের পর দিন নফসের ওপর ও আচার-আচরণের ওপর ধীরে ধীরে প্রভাব ফেলে উন্নতির দিকে না নিয়ে আসত, তাহলে আগের উমর আর পরের উমরের মধ্যে কোনো পার্থক্যই থাকত না। তাই 'সালাতে অটল থাকুন।'

সালাত আমাদের সাথে কী করে, তা বোঝার জন্য আমরা উমর বিন খাত্তাব ﷺ-কে সামনে রাখতে পারি। উমর ফারুক সালাতকে বিশ্ব পরিবর্তনের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছেন। যেভাবে দরকার ছিল সেভাবে তিনি সালাতকে বুঝেছেন, সালাতকে হৃদয়ঙ্গম করেছেন। তাই তাঁর সালাত প্রতিষ্ঠার রূপটা সালাতের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তিনি সালাতকে

বাস্তবতার সাথে যুক্ত করেছেন, সালাতকে প্রয়োগ করেছেন তাঁর সংকল্পবদ্ধ লক্ষ্যকে বাস্তবায়ন করার উদ্দেশ্যে। আর সে লক্ষ্যটি ছিল, বিদ্যমান অবস্থার পরিবর্তন।

এমনই একটি প্রয়োগ সম্পর্কে আমরা স্বয়ং উমর ফারুক ﷺ-এর মুখেই শুনি, তিনি বলেন, 'নিশ্চয় আমি সৈন্যদলসমূহকে আমার সালাতের মাঝেই প্রস্তুত করে নিই।'[৫৫]

সালাত তাঁকে সে শক্তি দিয়ে সহায়তা করেছে, যার মাধ্যমে তিনি নিজেকে উন্নত করেছেন। প্রথমে তিনি নিজেকে উন্নত করলেন, এরপর বিরাজমান বাস্তবতাকে পরিবর্তন করে উন্নতির দিকে নিয়ে গেছেন। নিজের মধ্যে সালাত প্রতিষ্ঠার সময় তিনি হৃদয়ঙ্গম করেন যে, তাঁর কাজ হচ্ছে সালাতের মূল্যবোধকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করা।

---

৫৫. আল-ফাতাওয়াউল কুবরা, ২ : ২২৪।

তিনি আমার রব

আপনি যে জায়গায় কাজ করেন, সে জায়গার মালিক বা পরিচালক আপনার খুবই কাছের লোক। শুধু তাই নয়, তিনি আপনাকে ভীষণ পছন্দও করেন। আপনি তার কাছে একজন বিশেষ পছন্দের মানুষ। অফিসের আরেকজন কর্মকর্তা এসে আপনাকে 'শীঘ্রই তোমাকে চাকরিছাড়া করছি' বলে হুমকি দিল। আপনি এ হুমকিকে কীভাবে মোকাবিলা করবেন?

যদি একটা কৌতুকপূর্ণ মুচকি হাসি দিয়ে তার হুমকির মোকাবিলা করেন, তাহলে কেউ আপনাকে দোষ দেবে না। আপনি অফিস পরিচালকের নিকটভাজন। তিনি অফিসের কোনো কর্মীর কথায় আপনাকে চাকরিচ্যুত করবেন না। এ কর্মীর হাতে সে ক্ষমতা নেই, যেটার বলে সে আপনাকে হুমকি দিতে পারত।

অন্যদিকে যদি এ হুমকির সামনে আপনি ভীত বা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন, তাহলে লোকে আপনাকে বোকা বা পাগল বলতে দ্বিধা করবে না। কেন আপনি উদ্বিগ্ন হবেন? অফিসের মালিক তো আপনার নিকটতম, আপনাকে পছন্দ করেন, আপনি তার কাছে প্রিয়।

এবার ভাবুন, এমন একজন রয়েছেন, যাঁর হাতে আপনার জীবনের ছোট থেকে বড় প্রতিটি জিনিস রয়েছে।...

আপনার প্রিয় চাকরিটা হারাতে চান না, একজন রয়েছেন যিনি তার গ্যারান্টি দিতে পারেন। আপনি ঋণের বোঝায় হাঁফিয়ে উঠেছেন, একজন রয়েছেন যিনি

আপনার সব ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করে আপনার বোঝা দূর করতে পারেন। আপনার ও আপনার স্ত্রীর মাঝে ঝগড়া লেগেই আছে, একজন রয়েছেন যিনি আপনাদের ঝগড়ার সুরাহা করে দিতে পারেন।

যদি এ পরাক্রমশালী সত্তা আপনার নিকটতম হয়, আপনাকে ভালোবাসে, তাহলে আপনার জীবন কেমন হবে?

যদি জীবনে এমন কাউকে পাওয়া যায়, তাহলে ভয়ের কোনো কারণ থাকে না, দুশ্চিন্তার কোনো জায়গাই থাকবে না আপনার জীবনে। যখনই কোনো সমস্যায় পড়বেন, তখনই সে মহান সত্তার শরণাপন্ন হবেন, তিনিই আপনার সব সমস্যার সমাধান করে দেবেন। এমনকি যদি আপনার বিরুদ্ধে পৃথিবীর সব মানুষও দাঁড়িয়ে যায়, তিনি আপনার জন্য যথেষ্ট।

আপনি জানেন কি, আপনার যে জীবনযাপন করা উচিত, এটাই হচ্ছে সে জীবন? আপনি জানেন কি, এ মহান সত্তার সাথে সম্পর্ক গড়া ও উন্নত করাই হচ্ছে সে জীবন?

ভয় ও শঙ্কাহীন জীবন; প্রত্যয় ও সাহস ভরা জীবন। হ্যাঁ, এমনটিই চান এ দুনিয়ার মালিক। তিনি চান, আপনি কেবল তাঁর সাথেই সম্পর্ক গড়ে তুলবেন। তাঁরই অনুগত হবেন। তাহলে তিনিই আপনার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবেন। আল্লাহর জন্যই সর্বোত্তম মর্যাদা। কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ নয়। আপনার চাকুরিজীবনে যদি এমন কিছু ঘটে, তাহলে আপনার নিকটজন, যিনি আপনাকে অনেক ভালোবাসেন, তিনিই আপনার সমস্যার সমাধান করবেন। আল্লাহ রব্বুল আলামিন যদি আপনাকে ভালোবাসেন, তবে আপনি সবকিছুই পেয়ে গেলেন, আপনার জন্য তিনিই যথেষ্ট।

আল্লাহু আকবার

আল্লাহ সবচেয়ে বড়। অনেক মানুষ এ বাস্তবতা ভুলে যায়। তাই সালাত বারবার এসে তাদের এ পরম বাস্তবতা স্মরণ করিয়ে যায়। তাই তো তাকবিরে তাহরিমা ছাড়া সালাত শুদ্ধই হয় না। প্রত্যেক সালাত আদায়কারীকে 'আল্লাহু আকবার' বলে সালাত শুরু করতে হয়। 'আল্লাহু আকবার' মানে আল্লাহ

সবচেয়ে বড়। তাকবিরে তাহরিমা যেন বুঝিয়ে দিতে চাইছে, সালাতের আগে যা কিছু তোমাকে উদ্বিগ্ন, ভীত করেছে, সেসবের স্থান নেই এখানে। এখন তুমি তাঁর কাছে এসেছ, যিনি সবকিছুর চাইতে অনেক অনেক বড়।

এটা ঠিক তেমন, যেমন একজন শিশু ভয় পেয়ে তার বাবার কাছে ছুটে যায়। আর কোনো কিছুই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সদৃশ নয়। আপনি আল্লাহর দিকে ছুটে আসুন সালাতের সময় হলেই আর দুনিয়াকে জানিয়ে দিন, 'আল্লাহু আকবার'—আল্লাহ সবচেয়ে বড়।

রব্বুল আলামিন

এরপর আপনি সালাতের শুরুতে যেসব পড়তে হয়, তা পড়বেন। এরপর আসবে উম্মুল কুরআন সুরা ফাতিহা—যে সুরা একজন সালাত আদায়কারী তার জীবনে সবচেয়ে বেশি বার তিলাওয়াত করে। এ সুরার প্রথম আয়াত :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

'যাবতীয় প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই জন্য।'[৫৬]

আপনি কি জানেন, কেন আপনি সালাতের প্রতি রাকআতের শুরুতে আল্লাহর প্রশংসা করেন?

কারণ তিনি রব্বুল আলামিন—জগৎসমূহের রব।

তিনি বিশ্বজগতের পালনকর্তা।

তিনি সকল রাজার প্রতিপালক, সকল বাদশাহর প্রতিপালক।

তিনি সকল বান্দার প্রতিপালক।

তিনি সকল কোম্পানির মালিক ও সম্পদশালীর প্রতিপালক।

তিনি সকল স্ত্রী-সন্তানের প্রতিপালক।

---

৫৬. সুরা আল-ফাতিহা, ১ : ১।

এ আয়াতটা যেন আপনি নিজের জন্যই পড়ছেন। আপনি নিজেই নিজেকে বার্তা দিচ্ছেন। যেসব বার্তার মাধ্যমে আপনি নিজের অন্তরকে শান্ত, অনুপ্রাণিত করতে পারেন এবং নিজের প্রত্যয় ও প্রত্যাশাকে সুরভিত করতে পারেন, এ বার্তাটি তাদের শিরোমণি। এ আয়াতটা পড়ে যেন আপনি নিজেকেই বলছেন, শান্ত হও, স্থির হও, এখন তুমি বিশ্বজগতের রবের সামনে দাঁড়িয়ে, তিনি সব ঠিক করে দেবেন।

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, তিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক। তাঁর রাজত্বে কেউ শরিক নেই। তিনিই সকল কিছুর মালিক ও প্রতিপালক। আল্লাহ বলছেন :

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا

'বলুন, "প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি সন্তান গ্রহণ করেননি, তাঁর রাজত্বে কোনো অংশীদার নেই এবং তিনি দুর্দশাগ্রস্ত হন না, যে কারণে তাঁর অভিভাবকের প্রয়োজন হতে পারে"; সুতরাং পূর্ণরূপে তাঁর মাহাত্ম্য ঘোষণা করুন।'[৫৭]

হ্যাঁ, সকল প্রশংসা আমার রব আল্লাহর জন্য, তাঁর কোনো শরিক নেই, তাঁর কোনো অভিভাবক বা সাহায্যকারীরও প্রয়োজন নেই।

হুদ ﷺ 'রব্বুল আলামিন' শব্দের মর্ম বুঝেছেন যথার্থভাবে। তাই তো তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে চ্যালেঞ্জ করে বলেছিলেন :

فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونِ - إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُم مَّا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

'তোমরা সবাই আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করো; আর আমাকে একটু অবকাশ দিয়ো না। আমি নির্ভর করি আমার ও তোমাদের রব আল্লাহর

৫৭. সুরা আল-ইসরা, ১৭ : ১১১।

ওপর; এমন কোনো জীবন-জন্তু নেই, যে তাঁর পূর্ণ আয়ত্তাধীন নয়; নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক সরল পথে রয়েছেন।'[৫৮]

একা একজন মানুষ তার পুরো সম্প্রদায়কে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে। তিনি তাদের ভয় পান না। এমনকি তিনি বলে দিয়েছেন, যেন তারা যত দ্রুত পারে তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে। এতটা সাহসী ও অকুতোভয় হওয়ার কারণ হচ্ছে, তিনি জানতেন, আল্লাহ রব্বুল আলামিন ছাড়া অন্য কেউ কিছুই করতে পারে না, তাঁর সবকিছুই আল্লাহর হাতে। একই বিশ্বাস আমাদের সবার মাঝে জেগে ওঠা উচিত, যখন আমরা الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ পড়ি।

সকল প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক মহান আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদের অন্য সবার অবস্থান বুঝিয়ে দিয়েছেন, তারা যত শক্তিশালীই হোক, যত বড় পদমর্যাদার অধিকারীই হোক, যত প্রস্তুতি বা সম্পদ তাদের থাকুক না কেন, তাদের হাতে কোনো শক্তি নেই। কুরআন তাদের ব্যাপারে আশ্চর্য কথা বলেছে :

وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ

'আর তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাকো, তারা তো খেজুর আঁটির অত্যন্ত পাতলা আবরণেরও মালিক নয়।'[৫৯]

কিতমির হচ্ছে, খেজুরের আঁটির ওপরের অত্যন্ত পাতলা আবরণ। খেজুর গাছ থেকে পড়া একটা খেজুর এতটাই তুচ্ছ, যে কেউ চাইলেই বিনামূল্যে তা উঠিয়ে নিতে পারে। (যদি খেজুর গাছটি কারও মালিকানায় না থাকে।) একটা খেজুর রাস্তা থেকে কুড়িয়ে নিলে কেউ সে খেজুরের মালিকানা দাবি করতেও আসবে না, এতটাই তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র সম্পদ। তাদের মালিকানা এ সামান্য সম্পদ খেজুরের সাথে তুলনা দেওয়া হয়নি; বরং তারা আরও তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র সম্পদ খেজুরের আঁটির পাতলা আবরণেরও মালিক নয়।

৫৮. সুরা হুদ, ১১ : ৫৫-৫৬।
৫৯. সুরা ফাতির, ৩৫ : ১৩।

আল্লাহ তাআলা বলছেন, যারা আল্লাহকে ছেড়ে অন্য কাউকে ডাকে, অন্য কারও ইবাদত করে, তাদের সেসব মিথ্যা মাবুদ অন্য কিছু তো দূরে থাক সামান্য কিতমিরেরও মালিকও নয়। সকল কিছুর একমাত্র মালিক আল্লাহ রব্বুল আলামিন।

এখানে ভাবনার বিষয় হচ্ছে, উক্ত আয়াতে 'না' বোঝানোর জন্য لا অব্যয়ের জায়গায় ما অব্যয় ব্যবহৃত হয়েছে। ما অব্যয় কোনো জিনিসকে মূল থেকে প্রত্যাখ্যান করে। আর لا অব্যয় ব্যবহৃত হলে অর্থ হতো, তারা ভবিষ্যতে এর মালিক থাকত না, কিন্তু বর্তমানে এর মালিক। তাই ما অব্যয় ব্যবহার করে সর্বোতভাবে তাদের মালিকানা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। তাই বলুন, الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - সকল প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য।

উদাহরণত, যদি আমি আপনাকে বলি, আপনার পাশে বসে থাকা অমুকের থেকে কিছু টাকা হাওলাত নিন। আপনি জানেন সে লোকটার কাছে টাকা-পয়সা নেই। তাহলে আপনি আমাকে বলবেন, فلان ما يملك المال অর্থাৎ অমুকের কাছে কানাকড়িও নেই।

তাই যখন আপনার নফস আপনাকে বলে, অমুক তো এমন পদমর্যাদার লোক, অমুকের এত টাকা-পয়সা, অমুক এত ক্ষমতার অধিকারী তার কাছে চাও। তখন এ আয়াত আপনাকে স্মরণ করিয়ে দেয়, 'না, সে কোনো কিছুরই মালিক নয়।' অতএব সকল প্রশংসা কেবল আল্লাহ রব্বুল আলামিনের।

স্বয়ং আল্লাহ তাআলা আপনাকে উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে, কীভাবে আপনি শান্তি ও স্থিরতার সাথে জীবনযাপন করবেন। আল্লাহ তাআলা সুরা আন-নাহলে বলেন :

ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

'আল্লাহ দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন, অন্যের মালিকানাভুক্ত এক দাস যে কোনো কিছু করারই ক্ষমতা রাখে না, অন্যদিকে আরেক লোক যাকে আমি আমার পক্ষ হতে উত্তম জীবিকা দান করেছি আর তার থেকে সে গোপনে-প্রকাশ্যে দান করে—তারা (এ দুজন) কি সমান? সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য, কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।'[৬০]

মালিকানাধীন দাস, যার কোনো কিছুর ওপরই ক্ষমতা নেই, এ দুনিয়ার সবাই এ রকম, চাই সে যেকোনো পদে থাকুক, চাই সে যেকোনো রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান হোক কিংবা বিশাল কোনো কোম্পানির পরিচালক হোক কিংবা পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী সেনাবাহিনীর সেনাপতি হোক, আল্লাহ তাআলা তাদের ব্যাপারে বলেছেন যে, তারা কোনো কিছুই করতে সক্ষম নয়, কারণ তারা সবাই সে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর মালিকানাধীন দাস, যিনি সকল কিছুর মালিক।

তাহলে এসব মালিকানাধীন দাস ও সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান মহান মালিক মহান প্রতিপালককে এক সমান ভাবেন কীভাবে আপনি?!

দুনিয়ার গল্প

মানুষের মুখে সব সময় শোনা যায়, দুনিয়ার জীবন কেবলই দুঃখ-কষ্টের। এখানে কেবল দুঃখ, দুশ্চিন্তা আর পেরেশানিই রয়েছে। হ্যাঁ, দুনিয়াকে এভাবেই সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু এরা আপনার কাছে পুরো চিত্রটা তুলে ধরে না। দুনিয়ার পুরো গল্পটা খুলে বলে না।

তারা গল্পের যে অংশটা বলে না, সে অংশটা এ দুনিয়ার মালিক আপনার সামনে তুলে ধরছেন :

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا - إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا - وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا - إِلَّا الْمُصَلِّينَ - الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ

৬০. সূরা আন-নাহল, ১৬ : ৭৫।

'মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে খুবই অস্থিরমনা করে, বিপদ তাকে স্পর্শ করলে সে হয় উৎকণ্ঠিত, কল্যাণ তাকে স্পর্শ করলে সে হয়ে পড়ে অতি কৃপণ, তবে সালাত আদায়কারীগণ এ রকম নয়, যারা তাদের সালাতে সদা নিষ্ঠাবান।'[৬১]

হ্যাঁ। এটাই দুনিয়া। দুনিয়াতে অস্থিরচিত্ততা রয়েছে, রয়েছে উৎকণ্ঠা, রয়েছে বার্ধক্য, রয়েছে দুশ্চিন্তা, রয়েছে ভয়। কিন্তু আপনি যদি নিয়মিত সালাত আদায়কারী হতে পারেন, যেভাবে রব্বুল আলামিন চেয়েছেন তেমন হতে পারেন, তাহলে আপনি এসব থেকে মুক্ত। এ দুনিয়ার স্রষ্টা মহান আল্লাহ আমাদের এটাই জানিয়েছেন। আর তাঁর চেয়ে অধিক জ্ঞানী আর কেউ নেই।

মানুষ আপনাকে যা বলেনি তা হচ্ছে, এ দুনিয়ার সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা দুনিয়াতে একটি জিজ্ঞাসাবাচক পত্র প্রেরণ করেছেন সেসব লোকের কাছে, যারা দুনিয়াবিরোধী যুদ্ধে দুনিয়া যখন তাদের ওপর বিপদের বজ্রপাত করে, তখন হতাশ হয়ে যায়, উৎকণ্ঠিত হয়ে যায়, পিছুটান নেয়। আল্লাহ বলেন :

أَمَّن جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۗ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

'বলো তো কে পৃথিবীকে বাসোপযোগী করেছেন এবং তার মাঝে নদ-নদী প্রবাহিত করেছেন এবং তাকে স্থিত রাখার জন্যে পর্বত স্থাপন করেছেন এবং (পাশাপাশি প্রবহমান) দুই সমুদ্রের মাঝখানে অন্তরায় রেখেছেন?! অতএব, আল্লাহর সাথে অন্য কোনো উপাস্য আছে কি? বরং তাদের অধিকাংশই জানে না।'[৬২]

কে পৃথিবীকে বাসোপযোগী করেছেন? আপনি যে পৃথিবীর বুকে হেঁটে বেড়ান, সে পৃথিবীকে যিনি বাসযোগ্য করেছেন, যিনি বিলিয়ন বিলিয়ন বছর ধরে পৃথিবীকে স্থির রাখতে সক্ষম, তিনি আপনার অন্তরকেও প্রশান্ত করতে সক্ষম, তিনি দুনিয়ার সব দুঃখ-দুশ্চিন্তার বিরুদ্ধে আপনার জন্য যথেষ্ট, আল্লাহ তাআলা

---

৬১. সুরা আল-মাআরিজ, ৭০ : ১৯-২৩।
৬২. সুরা আন-নামল, ২৭ : ৬১।

আপনার অন্তরকে শক্তিশালী ও মজবুত করলে কোনো কিছু কি আপনার ক্ষতি করতে পারে!

তিনি পৃথিবীর বুকে নদী সৃষ্টি করেছেন। যিনি এ পৃথিবীর বুক চিরে তার মাঝে নদী সৃষ্টি করতে পারেন, যে নদী কিয়ামত অবধি প্রবহমান থাকবে, তিনি আপনার জন্য প্রত্যেক বন্ধ দরজা খুলতে সক্ষম। কল্যাণের দ্বার উন্মুক্তকারী মহান আল্লাহ আপনার সাথে থাকলে দুনিয়ার সব দরজা আপনার জন্য বন্ধ হয়ে গেলেও আপনার কি কোনো ক্ষতি হতে পারে!

পৃথিবীকে স্থিত রাখার জন্য পর্বত স্থাপন করেছেন তিনি। যিনি এ পৃথিবীকে স্থির করেছেন বিশাল বিশাল পাহাড়-পর্বত স্থাপন করে, তিনি আপনার বিপদে আপনাকে স্থির রাখতে সক্ষম। আল্লাহ আপনাকে স্থির করলে কোনো বিপদে কি আপনার কোনো ক্ষতি হতে পারে!

তিনি (পাশাপাশি প্রবহমান) দুই সমুদ্রের মাঝখানে অন্তরায় রেখেছেন।... যিনি পরস্পরের পাশাপাশি থাকা দুই সাগরের মাঝখানে অন্তরায় রেখেছেন, এক সাগরের পানি অপর সাগরের পানির পাশে থাকলেও পরস্পরের সাথে মিশে না বাইরের কারও হস্তক্ষেপ ছাড়া। যিনি এমন অভিনব সৃষ্টির স্রষ্টা, যিনি দুই সাগরের মাঝখানে অন্তরায় করেছেন, তিনি কি আপনাকে ষড়যন্ত্রকারীদের ষড়যন্ত্র ও হিংসুকদের হিংসা থেকে বাঁচাতে পারবেন না!

দুনিয়ার জীবন যখন আপনাকে কোনো কষ্ট দেয়, যখন আপনার নফস আপনাকে অস্থিরতা বা হতাশার দিকে ঠেলে দিতে চায়, তখন তাকে এ আয়াতটি শুনিয়ে দিন :

أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۗ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ

'বল তো কে অসহায়ের ডাকে সাড়া দেন যখন সে ডাকে, কে কষ্ট দূরীভূত করেন এবং তোমাদের পৃথিবীর উত্তরাধিকারী করেন?!

সুতরাং আল্লাহর সাথে অন্য কোনো উপাস্য আছে কি? তোমরা অতি সামান্যই উপদেশ গ্রহণ করো।'[৬৩]

আমার রব সত্য বলেছেন। এ আয়াতটি সেসব আয়াতের পরে এসেছে, যেসব আয়াতে পৃথিবীর সৃষ্টি, নদ-নদীর সৃষ্টি, পাহাড় ও সাগরের সৃষ্টির কথা এসেছে। প্রথমে আল্লাহর বড়ত্ব প্রকাশ করে স্পষ্ট চিত্রটা তুলে ধরা হয়েছে, যেন আপনি বিপদে অস্থির না হন, যেন মহাক্ষমতাবান আল্লাহর প্রতি আস্থা রেখে আপনার অন্তর প্রশান্ত হয়।

কখনো কখনো আপনার অন্তর সংকীর্ণ হয়ে আসবে, হয়তো আপনার সামনে দুনিয়ার সকল দরজা বন্ধ হয়ে আসবে, হয়তো আপনি এমন পরীক্ষার সম্মুখীন হবেন যেখানে আপনি ক্ষমতাহীন—এটাই দুনিয়ার অবস্থা, এটা আমরা জানি। কিন্তু এখানে আপনাকে মনে রাখতে হবে, এ দুনিয়ার পালনকর্তা আপনার উদ্দেশে একটি স্পষ্ট চিঠিতে বলেছেন :

أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ

'আল্লাহর সাথে অন্য কোনো উপাস্য আছে কি?'

আল্লাহ হলেন এ দুনিয়ার স্রষ্টা। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তিনি দুনিয়ার সকল সমস্যার সামনে, সকল বিপদের মোকাবিলায় আপনার জন্য যথেষ্ট। আর আপনি দুনিয়াতে যেমন থাকার কথা তেমন থাকুন। দুনিয়ার জন্য উদ্বিগ্ন হবেন না। যদি দুনিয়াতে আপনাকে কোনো কিছুর সম্মুখীন হতে হয়, তাহলে দুনিয়ার মালিক ও পালনকর্তার কাছে তা পেশ করুন, যদি দুনিয়ায় ভালো থাকতে চান, তাহলে দুনিয়ার স্রষ্টার কাছে প্রার্থনা করুন।

---

৬৩. সুরা আন-নামল, ২৭ : ৬২।

পরীক্ষা কেন?

যদি বিষয়টি এমনই হয়, তাহলে কেন এসব পরীক্ষা, কেন মহাপ্রজ্ঞাবান আল্লাহ একের পর এক পরীক্ষায় ফেলেন আমাদের?!

পরীক্ষার মাঝে আল্লাহর হিকমত হচ্ছে, বান্দা আল্লাহর কাছে ছুটে গিয়ে নিজেকে সঁপে দেবে। যেসব বিষয় বস্তুগত হিসাব-নিকাশ ও মানুষের সীমাবদ্ধ দৃষ্টিতে অসম্ভব মনে হবে, সেসব ক্ষেত্রে আপনাকে আল্লাহর দিকে ছুটে যেতে হবে, এরপর অসম্ভব বিষয়টা সম্ভবে পরিণত হবে। তখন আপনি অনুভব করবেন, আপনি যেন পৃথিবীতে আল্লাহর অলিদের একজন হয়ে গেছেন। কারণ আল্লাহর কাছে ছুটে আসা ও তাঁর কাছে প্রার্থনা করার ফলে অসম্ভব সম্ভবে পরিণত হয়েছে।

অর্থাৎ যদি আপনি বিপদগ্রস্ত হন, তাহলে মহান আল্লাহর কাছে আসুন, তিনি আপনার বিপদ দূর করবেন। এভাবে আপনি অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করার পদ্ধতি অবলম্বন করবেন।

أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ

'বলো তো কে অসহায়ের ডাকে সাড়া দেন যখন সে ডাকে, কে কষ্ট দূরীভূত করেন এবং তোমাদের পৃথিবীর উত্তরাধিকারী করেন?!'[৬৪]

একটি সহজ সমীকরণ। সমীকরণটির দুটি দিক আছে। এক. আল্লাহর কাছে ছুটে এসে নিজেকে সঁপে দেওয়া। দুই. তাঁর কাছে দুআ করা। কিন্তু আমাদের অধিকাংশই যখন বিপদে পড়ে, তখন আল্লাহকে ছেড়ে অন্যদের কাছে চাইতে শুরু করে। আবার যখন আল্লাহর কাছে চাইতে আসে, তখন তার জন্য দুআ করতে একজনকে মাধ্যম হিসেবে নিয়ে আসে। ফলে সমীকরণ নষ্ট হয়ে যায়। সম্ভাবনাও উবে যায়।

'আল্লাহু আকবার' হচ্ছে সে বাক্য, যে বাক্য দিয়ে আপনি সালাত শুরু করেন, এ বাক্য সুখের সময় যেমন আপনার সঙ্গে থাকে, তেমনই দুঃখের সময় আপনার

---

৬৪. সূরা আন-নামল, ২৭ : ৬২।

সঙ্গ ছেড়ে যায় না। 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি জমিনে স্রেফ শান্ত ও সমাহিত মনে হলেও আসমানে বেশ উঁচু আওয়াজে প্রতিধ্বনিত হয় এবং আপনার সৌভাগ্য ত্বরান্বিত করে।

পরীক্ষা 'আল্লাহু আকবার' এর মর্যাদা বুঝাতে সহায়তা করে আমাদের। 'আল্লাহু আকবার' আমাদের অন্তরে তার উন্নত স্থান ও মর্যাদা গেঁড়ে দেয়। তাই যখন দুনিয়া আপনার বিরুদ্ধে নতুন কোনো যুদ্ধ শুরু করে, তখন দুনিয়া যেমন আছে তেমন তাকে চলতে দিন, মানুষ যেমন আছে তেমন চলুক, আপনি থাকুন 'আল্লাহু আকবার'-এর সাথে। আপনি যতক্ষণ আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করবেন, ততক্ষণ কোনো কিছুই আপনার ক্ষতি করতে পারবে না, কোনো পরীক্ষাই আপনাকে বিপদে ফেলতে পারবে না।

প্রচুর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে ঘেরা এ যুগে কীভাবে আমরা 'আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামিন'-এর মাহাত্ম্য বুঝব, যদি পরীক্ষা ও বিপদ না থাকে?! আমরা ঘুম থেকে উঠে নিজেদের সুস্থ দেখি, চোখ, কান, হাত-পা সবই ঠিক, নিরাপদে আছি। তখন কেউ যদি আমাদের জিজ্ঞেস করে, 'কী অবস্থা?' আমরা রাজ্যের অকৃতজ্ঞতা নিয়ে বলি, 'এই তো। আছি কোনো রকম।'

আমাদের বিদেশ যাত্রার সময় বিমান যখন অবতরণ করার নিকটবর্তী হয়, তখন আমরা মৃত্যুর প্রায় নিকটবর্তী থাকি। কিন্তু নিরাপদে বিমান অবতরণ করার পর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমরা সিট বেল্ট খুলে নিই। আল্লাহর কৃতজ্ঞতায় সিজদা করার পরিবর্তে মেজাজ বিগড়ে মোবাইলের স্ক্রিনের দিকে মনোযোগী হই। অথচ...

مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَٰنُ

'একমাত্র দয়াময় আল্লাহই (ওপরে) তাদের স্থির রাখে।'[৬৫]

তাই 'আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামিন'-এর মাহাত্ম্য বোঝার জন্য পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যাওয়া অপরিহার্য। প্রথমে এমন সংকীর্ণ পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে যে, আমাদের প্রাণ যায় যায় অবস্থা, তখন আল্লাহর সাহায্যে আমরা সে পরিস্থিতি

৬৫. সুরা আল-মুলক, ৬৭ : ১৯।

থেকে বেরিয়ে আসব আর তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হব। আল্লাহ-প্রদত্ত পরীক্ষা আমাদের ইমানকে রিচার্জ করবে, যেন আমরা আমাদের ইমানি শক্তি হারিয়ে না ফেলি।

অনেকে হয়তো আপনাকে বলবে, 'এ দুনিয়ায় তোমার কপালে কেবল দুর্ভাগ্যই আছে। সৌভাগ্যের ছিটেফোঁটাও নেই তোমার কপালে।' যারা মহান রিজিকদাতা আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে জানে না, তারাই এ রকম কথা বলতে পারে। আল্লাহ তাআলা আপনার জন্য সৌভাগ্য অর্জনের উপায় কোনো রকম জটিলতা না রেখে স্পষ্ট করে বাতলে দিয়েছেন।

যদি আপনি সৌভাগ্যবান হতে চান, তবে তাকওয়া অবলম্বন করুন। যারা আপনাকে দুর্ভাগ্য-সৌভাগ্যের পাঠ শোনাতে আসে আপনি তাদের সেসব কথা ছুড়ে ফেলে মহাপ্রজ্ঞাময় আল্লাহর কথা শুনুন :

وَمَن يَتَّقِ اللهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا - وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

'যে আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার নিষ্কৃতির ব্যবস্থা করে দেবেন। আর তাকে তার ধারণাতীত জায়গা থেকে রিজিক দেবেন।'[৬৬]

তাই এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করুন, যেন তিনি আপনার সামনেই রয়েছেন আর হাজারো সৌভাগ্যকে নিজের করে নিন। এ দুনিয়ার স্রষ্টা আপনাকে ওয়াদা দিয়েছেন। তাঁর ওয়াদার অন্যথা হয় না।

তিনিই আমাকে আরোগ্য করেন

কখনো দুনিয়া আপনাকে নিয়ে তার মতো করে খেলে। আপনি তখন নিজেকে সমস্যার আবর্তে ঘুরপাক খেতে দেখেন। আপনি অনেক কষ্টে জীবনকে এমনভাবে গুছিয়ে তুলেছেন, যেন বিপদের ছিটেফোঁটাও আপনার গায়ে না লাগে। কিন্তু আপনার সব হিসেবে ভণ্ডুল করে দিয়ে আপনার পুরো পরিকল্পনাটাই কখনো ভেস্তে যায়। মুসিবত এসে আপনাকে ঘিরে ধরে। দুনিয়াটা এমনই। হঠাৎ করে দুনিয়া আমাদের সাথে অনেক কিছুই করে ফেলে। কারও কারও জীবনকে একেবারে ওলটপালট করে দেয়।

---

৬৬. সুরা আত-তালাক, ৬৫ : ২-৩।

কিন্তু মহান আল্লাহ তাআলা, এ দুনিয়ার মালিক, সবকিছু তাঁরই নিয়ন্ত্রণাধীন, তিনি তাঁর প্রিয় নবি ইবরাহিম ﷺ-এর ভাষায় আমাদের শিখিয়েছেন বিপদ ও রোগের সময় কী করতে হয়। ইবরাহিম ﷺ-এর সে কথা উঠে এসেছে কুরআনে :

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ

'আর আমি যখন রোগাক্রান্ত হই, তখন তিনিই আমাকে আরোগ্য করেন।'[৬৭]

দুনিয়াকে তার রুক্ষতা ও কঠোরতা নিয়ে থাকতে দিন, আপনি থাকুন তাঁর সাথে যাঁর হাতে আপনার সৌভাগ্য। আপনি থাকুন মহা দয়াবান, পরম করুণাময়, সর্বশক্তিমান, মহা পুরস্কারদাতা, মহান রাজাধিরাজ আল্লাহ রব্বুল আলামিনের সাথে।

শাইখ ডাক্তার আব্দুল মুহসিন আহমাদের মুখে শোনা ঘটনা। ৪২ বছর বয়সের এক নারী হার্ট সার্জারির রুমে নিজ পায়ে হেঁটে প্রবেশ করল সুস্থ চোখ, সুস্থ কান ও সুস্থ মুখ নিয়ে। কিন্তু তার হৃদযন্ত্র অপারেশনের মাঝখানে হঠাৎ করে থেমে গেল। ডাক্তারগণ তার হৃদযন্ত্রে শক্তিসঞ্চার[৬৮] করার চেষ্টা করলেন। তার হৃদযন্ত্র আবার কাঁপতে শুরু করল। কিন্তু এরই মাঝে তার মগজে রক্তপ্রবাহ বন্ধ ছিল তিন মিনিটের মতো। ফলে মগজের কোষগুলো মরে গেল। (সকল প্রশংসা আল্লাহ রব্বুল আলামিনের, যাঁর দয়ায় আমাদের মগজের কোষগুলোতে রক্ত প্রবাহিত হয় আমাদের কোনো চেষ্টা-প্রচেষ্টা ছাড়াই।)

ডাক্তার আব্দুল মুহসিন বলেন, মগজের কোষসমূহ মরে গেলে কেবল তিনিই তা পুনর্জীবিত করতে পারেন, যিনি প্রথমবার এসব কোষ সৃষ্টি করেছেন। যে মহিলার হৃদযন্ত্র ছাড়া সবকিছুই ঠিক ছিল, এখন সে মহিলা অপারেশন রুম থেকে বের হলো অন্যদের ওপর ভর করে, না কিছু দেখছিল, না কিছু শুনছিল, না কিছু বলতে পারছিল, না নিজের হাত-পা নাড়াতে পারছিল।

---

৬৭. সুরা আশ-শুআরা, ২৬ : ৮০।
৬৮. Cardiac resuscitation।

নয় মাস এভাবে পড়ে রইল। মৃত মস্তিষ্ক নিয়ে। স্থির শরীর নিয়ে। পুরো দেহের মধ্যে কেবল হৃদযন্ত্রটাই সচল। মুখ হা করা। মুখ দিয়ে শ্বাস নেয়।

এক রাতের কথা। এক ডাক্তার ছিলেন বেশ আল্লাহওয়ালা। তিনি জানতেন, কীভাবে এ দুনিয়া চলে। জানতেন, কীভাবে দুনিয়াকে সামলাতে হয়। তিনি সে মহিলার রুমের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। মহিলার ছেলেকে দেখলেন, খুব কাঁদছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কাঁদার কারণ কী? ছেলে বলল, তার মায়ের জন্য। কারণ তার মা কিয়ামতের আগে আর কথা বলবে না। ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন, কে তাকে এ কথা বলল? ছেলে জানাল, হাসপাতালের সকল ডাক্তারই এ কথা বলেছে। তারা বলছে, তার মা আর কথা বলবে না, এভাবেই নিথর অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে।

আল্লাহওয়ালা ডাক্তার বললেন, 'এসব ডাক্তার কি তোমার মায়ের সামান্য একটা কোষও সৃষ্টি করেছে?! তারা যা ইচ্ছে বলুক। আমরা কেবল আল্লাহ তাআলার কথাই শুনব। তিনি বলেন :

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ

"আর যদি আল্লাহ আপনাকে কোনো কষ্ট দেন, তবে তিনি ব্যতীত তা অপসারণকারী কেউ নেই।"'[৬৯]

এরপর তিনি সে নিথর মহিলার পাশে আশ্চর্য সব আয়াত পড়তে লাগলেন। তিনি মহান স্রষ্টার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে পড়তে লাগলেন কুরআনের এক একটি আয়াত। প্রথমে সুরা ফাতিহা পড়লেন। এরপর পড়লেন সুরা ইসরার আয়াত :

أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا

'আমরা অস্থিতে পরিণত ও চূর্ণবিচূর্ণ হলেও কি নতুন সৃষ্টিরূপে উত্থিত হব?'[৭০]

---

৬৯. সুরা আল-আনআম, ৬ : ১৭।
৭০. সুরা আল-ইসরা, ১৭ : ৪৯।

তিনি দুআ করতে লাগলেন, 'হে রব, এ তো কেবল কিছু মৃত কোষ। হাড় বা চূর্ণবিচূর্ণ উপাদানও নয়।'

উপরোক্ত আয়াতের কথাটা ছিল সেসব লোকের, যারা পুনরুত্থানে বিশ্বাস করত না। আল্লাহ তাদের যে প্রত্যুত্তর দিয়েছিলেন, সে ডাক্তার এবার সেটা তিলাওয়াত করলেন :

قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا - أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ

'বলুন, তোমরা যদি পাথরও হয়ে যাও অথবা লোহা অথবা এমন কিছু যা তোমাদের ধারণায় খুবই কঠিন। (তবুও তোমাদের ওঠানো হবে।)'[৭১]

আল্লাহ বলেন, এমনকি যদি তোমরা এমন কিছুও হয়ে যাও, যার সাথে মানুষের শরীরের সাথে দূরতম সম্পর্কও নেই, যেমন : পাথর বা লোহা, তবুও তোমাদের পুনরুত্থিত করা হবে। এমনকি যত অসম্ভব কিছু তোমরা কল্পনা করো না কেন, তোমাদের তা থেকে পুনরুত্থিত করা হবে। যেন এ আয়াতটি সেসব ডাক্তারের প্রতি বার্তা, যারা বলেছিল, সে নারীর মগজের কোষ মৃতই থেকে যাবে :

فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا ۖ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ ۖ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا

'তারা বলবে, "কে আছে এমন, যে আমাদের পুনরায় জীবিত করবে?" বলুন, "তিনিই যিনি তোমাদের প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন।" তখন তারা (ঠাট্টার ছলে) আপনার সামনে মাথা নেড়ে বলবে, "সেটা কখন ঘটবে?" বলুন, "হতে পারে সেটা শীঘ্রই ঘটবে।"'[৭২]

---

৭১. সুরা আল-ইসরা, ১৭ : ৫০-৫১।

৭২. সুরা আল-ইসরা, ১৭ : ৫১।

এরপর সুরা রুম থেকে তিলাওয়াত করলেন :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنتُمْ تَخْرُجُونَ

'তাঁর অন্যতম নিদর্শন এই যে, আকাশ ও পৃথিবী তাঁর হুকুমেই প্রতিষ্ঠিত আছে। অতঃপর তিনি যখন তোমাদের মাটি থেকে ওঠার জন্য একটি ডাক দেবেন, তখন তোমরা উঠে আসবে।'[৭৩]

ডাক্তার দুআ করতে লাগলেন, 'হে রব, আসমান ও জমিন সবকিছুই আপনার আদেশে দাঁড়িয়ে আছে। আপনি তো এ রোগীকেও দাঁড় করাতে পারেন।

وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ۚ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

"তিনিই প্রথমবার সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করেন, তারপর তিনি এটিকে পুনর্বার সৃষ্টি করবেন। এটি তাঁর জন্য অতি সহজ। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে সর্বোচ্চ মর্যাদা তাঁরই। তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"[৭৪]

হে রব, আমি আপনার কাছে সমস্ত সৃষ্টি পুনরাবৃত্তি করার দুআ করছি না। হে রব, আপনার কাছে কেবল এটুকুই চাইছি যে, এ অসহায় নারীর মগজের কোষগুলো পুনর্জীবিত করে দিন।'

এরপর তিনি সুরা বাকারা থেকে তিলাওয়াত করলেন :

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ

'আপনি কি তাদের প্রতি লক্ষ করেননি, মৃত্যুর বিভীষিকাকে এড়ানোর জন্য যারা নিজেদের গৃহ হতে বহির্গত হয়েছিল? অথচ তারা ছিল

---

৭৩. সুরা আর-রুম, ৩০ : ২৫।
৭৪. সুরা আর-রুম, ৩০ : ২৭।

হাজার হাজার সংখ্যা। তখন আল্লাহ তাদের বললেন, "তোমরা মরো।" এরপর পুনরায় তিনি তাদের জীবন দান করলেন।'[৭৫]

এরপর তিনি দুআ করলেন, 'হে রব, আমি আপনার কাছে এতটুকু চাইছি, এ জীবন্মৃত নারীকে আপনি জীবিত করে দিন।'

أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِّلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

'কিংবা এমন ব্যক্তির ঘটনা সম্পর্কে (আপনি কি চিন্তা করেননি) যে এক নগর দিয়ে এমন অবস্থায় যাচ্ছিল, যে নগর উজাড় অবস্থায় ছিল। সে বলল, "আল্লাহ এ নগরীকে এর মৃত্যুর পরে কীভাবে জীবিত করবেন?" তখন আল্লাহ তাকে একশ বছর মৃত রাখলেন। তারপর তাকে জীবিত করে তুললেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি এ অবস্থায় কতকাল ছিলে?" সে বলল, "একদিন ছিলাম কিংবা একদিনের চেয়েও কম।" আল্লাহ বললেন, "বরং তুমি একশ বছর ছিলে, এক্ষণে তুমি তোমার খাদ্যের ও পানীয়ের দিকে লক্ষ করো, এটা পচে যায়নি। আর গাধাটার দিকে তাকিয়ে দেখো। আর এতে উদ্দেশ্য এই যে, আমি তোমাকে মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত বানাব। আবার তুমি হাড়গুলোর দিকে লক্ষ করো, আমি কীভাবে ওগুলো জোড়া লাগিয়ে দিই, তারপর গোশত দ্বারা ঢেকে দিই।" এরপর যখন তার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল, তখন সে বলল, "আমি জানি, আল্লাহই সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।"'[৭৬]

---

৭৫. সুরা আল-বাকারা, ২ : ২৪৩।
৭৬. সুরা আল-বাকারা, ২ : ২৫৯।

কুরআন তিলাওয়াত করতে করতে ডাক্তার সে নারীর মস্তিষ্কের কোষের এক্সরে দেখছিলেন। মস্তিষ্কের কোষগুলো যেন উজাড় ঘরের মতো হয়ে আছে। তিনি দুআ করতে লাগলেন, 'হে রব, আপনি একজন মানুষকে একশ বছর পর মৃত রেখে জীবিত করেছেন, এ নারী তো (অর্থাৎ তার মগজের কোষগুলো) কেবল নয় মাস হলো মৃত, হে রব, তার জীবন ফিরিয়ে দিন।'

তিনি কুরআন তিলাওয়াত করতে থাকলেন আর দুআ করতে থাকলেন, 'হে রব, ডাক্তাররা বলেছে, "তার মগজের কোষগুলো আর কখনো ঠিক হবে না" কিন্তু আপনি সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান, হে আল্লাহ।' এ বলে তিনি كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا পড়তে পড়তে মনের ভেতর ভাবতে লাগলেন, আল্লাহ তাআলা এসব মৃত কোষকে পুনর্জীবিত করতে সক্ষম, আল্লাহ তাআলা এসব মৃত কোষকে পুনর্জীবিত করতে সক্ষম।...

তিনি আয়াতগুলো পড়ে সে নারীকে ডাক দিলেন। এবার মহিলা তার মাথা নাড়ালেন। ডাক্তার সাহেব বললেন, 'আপনার হাত-পা নাড়ান।' মহিলা কথামতো তা-ই করলেন। এরপর মহিলা চোখ খুললেন। সাথে সাথে সেই ছেলে ডাক্তারের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে তার পায়ে চুমু খেতে লাগল। ওদিকে রোগী মহিলাটি (অমুসলিম) চিৎকার করে উঠলেন দীর্ঘ নয় মাস পর সুস্থ হয়ে। ঘটনাটি ঘটেছে রিয়াদের সামরিক হাসপাতাল প্রিন্স সুলতান কার্ডিয়াক সেন্টারে।

আমি আবারও বলছি, দুনিয়া যেভাবে আছে সেভাবে থাকুক, আপনি আল্লাহর সাথে থাকুন, যিনি সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান, সবকিছু করতে পারেন যিনি।

তিনি যা চান, তা করতে পারেন

জন্মের আগেই হত্যার আদেশ জারি হওয়ার গণহত্যার ঘটনা পৃথিবীর ইতিহাসে বহুবার ঘটেছে, এখনো ঘটছে। বরং এখন তো এতটা জঘন্য পর্যায়ে চলে গেছে যে, এ দুনিয়া যেন একটা নিষ্পাপ শিশুর ওপর তার কঠোরতা চাপিয়ে দিতে তার চূড়ান্ত রূপ দেখাচ্ছে।

একবার এক নির্বোধ রাজা স্বপ্নে দেখল, এমন এক মানুষের হাতে তার রাজ্যের পতন হবে, যে মানুষটা তার যুগেই তার রাজ্যে জন্ম নেবে। তাই নির্বোধের মতো সে রাজা আদেশ জারি করল, প্রতিটি নবজাতক ছেলেকে হত্যা করতে।

একবার ভেবে দেখুন, সে যুগের মায়েদের অবস্থা তখন কতটা করুণ হয়ে উঠেছিল! এ দুনিয়ার জন্য এ রকম ঘটনা বিরল নয়। আমরা জানি, দুনিয়ার স্বভাবটাই এ রকম। কিন্তু আমরা এও জানি যে, পরাক্রমশালী আল্লাহ পুরো দুনিয়ার সব ষড়যন্ত্র-পরিকল্পনা ভেস্তে দিতে পারেন, তিনিই তো এ দুনিয়ার মালিক, তিনিই তো এ দুনিয়া সৃষ্টি করেছেন।

হয়তো সে সময়ের মায়েদের কাছে সন্তানের জীবনের বদলে নিজের জীবন বিসর্জন দেওয়া বেশি সহজ ছিল। নিঃসন্দেহে তারা তাদের সন্তানকে প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসতেন। নবজাতক সন্তানের নিহত হওয়া তাদের জন্য অনেক দুঃখের ও উদ্বেগের ছিল। নির্বোধ রাজার ফরমান জারির পর থেকে পুরো সময়টা এক অভাবনীয় ভয় ও আতঙ্কে কাটতে থাকে।

শিশু দুনিয়াতে আসার আগেই দুনিয়া তার নিষ্ঠুর পরিণতির ব্যবস্থা করে রেখেছিল। দুনিয়া যতটা পেরেছে পরিকল্পনা এঁটেছে। এমনভাবে ষড়যন্ত্রের নীলনকশা এঁকেছে, যেন তার কাছ থেকে পালানোর কোনো পথই নেই। তবে এ অবস্থা ততক্ষণ ছিল যতক্ষণ একটি নতুন 'সহগ'[৭৭] দুনিয়ার হিসাবে প্রবেশ না করল। এ 'সহগ' পূর্বের সমস্ত ষড়যন্ত্রকে পরিবর্তন করতে সক্ষম ছিল।

---

৭৭. গণিতের পরিভাষায়, কোনো একপদী রাশিতে চলকের সাথে যখন কোনো সংখ্যা গুণক হিসেবে যুক্ত হয়, তখন ওই গুণককে রাশিটির সহগ বলে।

আল্লাহর ভালোবাসা। আল্লাহ এ শিশুকে ভালোবাসলেন। আমরা জানি আল্লাহর ভালোবাসা কীভাবে পেতে হয়। আল্লাহর ভালোবাসায় পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পাল্টে গেল তার জন্য।

একটা শিশু। যার কিছুই করার ক্ষমতা নেই। একই রকম অসহায় তার মাও। শিশুকে জন্ম দেওয়ার পর ঠিকমতো চিকিৎসাও পাননি তিনি। কিন্তু এখানে কারও পরিচয় গুরুত্বপূর্ণ নয়। গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সে ব্যক্তি কার সাথে আছে! সে যখন মহাশক্তিশালী আল্লাহ রব্বুল আলামিনের সাথে আছে, তখন তার ভয় কীসের!

আমরা এতক্ষণ কথা বলছিলাম মুসা ﷺ-এর মাকে নিয়ে। মুসা ﷺ যখনই কেঁদে উঠতেন বা আওয়াজ করে উঠতেন, তখনই যেন তাঁর মায়ের প্রাণ বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম হতো। কতভাবেই না তিনি তাঁকে চুপ করানোর চেষ্টা করলেন। কেবল একবার... একবার যদি ফিরআওনের সৈন্যদের কানে যায়, তাহলে তার সন্তানের জীবনাবসান নিশ্চিত!

এ ভয় ও শঙ্কা মুসা ﷺ-এর মায়ের অন্তর ততক্ষণ অস্থির করে রেখেছে, যতক্ষণ না আল্লাহর পক্ষ থেকে বার্তা এল। আল্লাহ যিনি চিরঞ্জীব, যিনি চিরস্থায়ী, যিনি সব জানেন, সবকিছুর মালিক যিনি, তাঁর কাছ থেকে বার্তা এল। আপনার কী মনে হয়? কী ছিল এই বার্তায়?

এ বার্তাটা মানুষের আওতারও বাইরের কিছুকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করছিল একরকম। বার্তায় আদেশ ছিল এমন, 'যখন তোমার ছেলের প্রাণ সংশয়ের প্রবল আশঙ্কা দেখা দেবে, তখন তাকে সাগরে ছুড়ে দেবে।'

যে সাগরে নামতে সে যুগের প্রবল শক্তিধর ও সাহসী পুরুষের অন্তরও প্রচণ্ড ভয়ে কেঁপে উঠত। যে সাগরে নামতে ফিরআওনের প্রশিক্ষিত সৈন্যরাও প্রাণসংশয়ের ভয় করত। সে সাগরে এক মাকে তার নবজাতক সন্তানকে ছুড়ে ফেলতে হবে! আল্লাহ ছাড়া কোনো আশ্রয় নেই, কোনো শক্তি নেই। আল্লাহর প্রেরিত বার্তাটি যেন সে-ই মাকে বলছে, এটা গুরুত্বপূর্ণ নয় যে, তুমি কে, বরং গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে তোমার পাশে কে আছেন।

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ

'আমি মুসার মায়ের প্রতি ওহি করলাম যে, তাকে স্তন্য পান করাতে থাকো। যখন তুমি তার সম্পর্কে আশঙ্কা করবে, তখন তুমি তাকে দরিয়ায় নিক্ষেপ করবে, আর তুমি ভয় করবে না, দুঃখও করবে না, আমি তাকে অবশ্যই তোমার কাছে ফিরিয়ে দেবো আর তাকে রাসুলদের একজন করব।'[৭৮]

আমরা এখানে দেখছি 'নিজেকে সঁপে দেওয়া'র নিয়মটি বারবার পুনরাবৃত্ত হচ্ছে। আমরা আগে বলে এসেছি, আল্লাহর কাছে নিজেকে সঁপে দেওয়ার পরই অসম্ভব জিনিস সম্ভবে পরিণত হয়। এখানে দেখুন, যে দুধের শিশুর কপালে মৃত্যু পরোয়ানা ঝুলছিল তার জন্মের আগ থেকে, আল্লাহ তাআলা অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করে তাকে বাঁচালেন এবং পরবর্তী সময়ে তাকে রাসুল বানালেন।

মজার ব্যাপার হচ্ছে, মুসা ﷺ-এর মা দিনের প্রথম প্রহরে ভয়ে ও শঙ্কায় ছিলেন কখন তার ছেলে কেঁদে ওঠে আর ফিরআওন ও তার সৈন্যরা টের পেয়ে তাকে মারতে আসে; অন্যদিকে দিনের শেষ প্রহরে মুসা ﷺ ফিরআওনের প্রাসাদে চিৎকার করে কাঁদছেন আর ফিরআওন তার খিদে মিটানোর জন্য দৌড়ঝাঁপ করছে।

إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ - أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي - إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَنْ يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ

'যখন আমি তোমার মায়ের অন্তরে ইশারায় নির্দেশ দিয়েছিলাম, "তুমি মুসাকে সিন্দুকের মধ্যে রাখো। তারপর তা দরিয়ায় ভাসিয়ে দাও।"

---

৭৮. সুরা আল-কাসাস, ২৮ : ৭।

অতঃপর দরিয়া তাকে পাড়ে ঠেলে দেবে। তাকে আমার শত্রু ও তার শত্রু উঠিয়ে নেবে। আমি আমার নিকট হতে তোমার প্রতি ভালোবাসা ঢেলে দিয়েছিলাম, যাতে তুমি আমার দৃষ্টির সম্মুখে প্রতিপালিত হও। যখন তোমার বোন গিয়ে বলল, "তোমাদের কি বলে দেবো, কে এই শিশুর তত্ত্বাবধান ও প্রতিপালনের ভার নিতে পারে?" এভাবে আমি তোমাকে তোমার মায়ের কাছে ফিরিয়ে আনলাম, যাতে তার চোখ জুড়ায় আর সে দুঃখ না পায়।'[৭৯]

যে আল্লাহ মুসা ﷺ-এর মাকে তার ভয় ও শঙ্কার চূড়ান্ত মুহূর্তে সান্ত্বনা দিয়েছেন এই বলে :

وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي

'আর তুমি ভয় করবে না, দুঃখও করবে না।'

একই আল্লাহ আমার ও আপনার উদ্দেশে বলছেন :

وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ

'আকাশে রয়েছে তোমাদের রিজিকের উৎস ও প্রতিশ্রুত সবকিছু।'[৮০]

তাহলে আমাদের দুশ্চিন্তা-উদ্বেগের কোনো কারণ থাকে না।

আমাদের অন্তর যেন প্রশান্ত থাকে, আমরা যেন নিজেদের পবিত্র করার কাজে পরিশ্রম ও সাধনা করি, আমরা যেন মানুষের কাছে হাত না পাতি, সে জন্য সে আল্লাহ আমাদের কাছে বার্তা পাঠিয়েছেন :

وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ

'মূলত তারা তাদের এ কাজ দ্বারা আল্লাহর হুকুম ছাড়া কারও ক্ষতি করতে পারত না।'[৮১]

---

৭৯. সুরা তহা, ২০ : ৩৮-৪০।
৮০. সুরা আজ-জারিয়াত, ৫১ : ২২।
৮১. সুরা আল-বাকারা, ২ : ১০২।

এ আয়াতে তিনি আমাদের সান্ত্বনা দিয়েছেন যেন আমরা দুশ্চিন্তা না করি, নিশ্চিন্তে জীবনযাপন করি এবং হিংসা, জাদু ও জিন প্রভৃতির অনিষ্ট নিয়ে দুশ্চিন্তা না করি। যেন আমরা জেনে নিই, মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর অনুমতির বাইরে কোনো কিছু আমাদের ক্ষতি করতে পারবে না। তাই যেন আমরা নিশ্চিন্ত মনে আল্লাহর ভালোবাসা তালাশে পরিশ্রম ও সাধনা করি।

তাই দুনিয়া যেমন আছে, তেমনই থাকুক। দুনিয়ার মানুষ আপনাকে নিয়ে যা ইচ্ছে ভাবুক। আপনি আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গড়ুন, যিনি মুসা ﷺ-কে অসহায় শিশু অবস্থায় সে সাগর থেকে বাঁচিয়ে এনেছেন, যে সাগরে ফিরআওন ও তার সৈন্যরা প্রচুর প্রস্তুতি ও প্রবল শক্তি থাকা সত্ত্বেও নিকৃষ্টভাবে মৃত্যুবরণ করেছে। জেনে নিন, আল্লাহ যদি আপনার সাথে থাকেন, তাহলে কে আছে এমন, যে আপনার ক্ষতি করবে!

গোপন কথা

নুহ ﷺ তাঁর সম্প্রদায়কে হিদায়াতের পথে আনার জন্য দাওয়াতের সব পথ ও পন্থা অবলম্বন করলেন। ৯৫০ বছরের দাওয়াতের পর আশানুরূপ ফল এল না। তাই তিনি এবার সিদ্ধান্ত নিলেন তাঁর সাধ্যের মধ্যে সর্বশেষ পন্থা হিসেবে গোপনে দাওয়াত দেবেন। যাতে এর মাধ্যমে তাঁর সম্প্রদায়কে হিদায়াতের পথে আনা যায়।

মানুষ এ দুনিয়াতে যা কিছু চায় এবং আশা করে সবটাই এ গোপন কথার অন্তর্ভুক্ত। এ গোপন কথার সারমর্ম হচ্ছে, স্রষ্টার সাথে মানুষের বিশেষ সম্পর্ক হচ্ছে একটি শর্ত পূরণ করার, মানুষ যদি সে শর্ত পূরণ করে, তাহলে প্রতিদানে আল্লাহ তাদের আশা ও স্বপ্ন পূরণ করেন।

কিন্তু কওমে নুহ এটাকে অবজ্ঞা করেছে। তারা এ শর্ত পূরণ করেনি। বরং তারা জোর দিয়ে বলেছে, তাদের মিথ্যা প্রভুরা তাদের স্বপ্ন সত্যি করতে সক্ষম। অবশেষে তারা তাদের মিথ্যা প্রভুসহ পানির নিচে ডুবে মরল।

আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, পরম দয়ালু আল্লাহ আমাদেরকে শত শত বছরের অপেক্ষায় না রেখে এ গোপন কথাকে আমাদের সামনে সরাসরি স্পষ্ট করে

তুলে ধরেছেন। হয়তো এ গোপন কথা বিশেষ করে কেবল নবিদের বলা হতো। কিন্তু আল্লাহ তাআলা এ গোপন কথা আমাদের জানাতে চাইলেন আর আমাদের কুরআনে সে কথা তুলে ধরেছেন।

আরও আশ্চর্যের হচ্ছে, আমাদের প্রতিক্রিয়াও কওমে নুহ থেকে ভিন্ন ছিল না। অনেকে এ গোপন রহস্য জেনেও তা অবজ্ঞা করেছে এবং করছে। সবাই নিজের বানানো প্রভুর কাছে গিয়ে ইচ্ছা পূরণের প্রার্থনা করছে।

কুরআনুল কারিম নুহ ﷺ-এর ভাষ্যে বলছে :

ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا

'অতঃপর আমি প্রকাশ্যভাবেও তাদের কাছে প্রচার করেছি, আর গোপনে গোপনেও তাদের বুঝিয়েছি।'[৮২]

এখানে তিনি এমনভাবে কথাটা বলছেন, যা থেকে বোঝা যায় তাঁর সম্প্রদায়কে হিদায়াতের পথে আনার এটাই শেষ সম্বল তাঁর। গোপনে বোঝানোর সময় তাদের জীবন সফল হওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন, বললেন একটা শর্ত পূরণ করলেই যথেষ্ট। যদি তোমরা এ কাজটা করো, তাহলে তোমাদের জীবন সফল হবে নিশ্চিত।

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ

'আমি বলেছি, তোমরা তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা চাও।'[৮৩]

ইসতিগফার। পরম ক্ষমাশীল আল্লাহর কাছে খালিস দিলে ক্ষমা চাওয়ার নাম ইসতিগফার। চাই তার পদ্ধতি যেটাই হোক না কেন। তো এ শর্ত পূরণ করলে কী পাওয়া যায়? ইসতিগফারের শর্ত পূরণ করলে একজন মানুষের দুনিয়ার প্রায় সব আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়।

---

৮২. সুরা নুহ, ৭১ : ৯।
৮৩. সুরা নুহ, ৭১ : ১০।

إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا - يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا - وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا

'তিনি বড়ই ক্ষমাশীল। (তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা করলে) তিনি অজস্র ধারায় তোমাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, তিনি তোমাদের সমৃদ্ধ করবেন ধন-সম্পদ ও সন্তানসন্ততিতে এবং তোমাদের জন্য স্থাপন করবেন উদ্যান এবং প্রবাহিত করবেন নদীনালা।'[৮৪]

যিনি আসমানসমূহ ও জমিনের মালিক, তিনি এখানে ওয়াদা করেছেন। এর আগে বলা হয়েছে, ওয়াদা বাস্তবায়ন না করে পুরো দুনিয়া ধ্বংস করে দেওয়াই তাঁর জন্য অধিক সহজ। তিনি তাঁর ওয়াদা রাখবেন। তাঁর ওয়াদার অন্যথা হয় না। তাই বলছি, দুনিয়া যেভাবে আছে সেভাবে থাকুক। দুনিয়া দুনিয়ার পথে যাক। আমরা থাকব পরম দয়ালু আল্লাহর ওয়াদার সাথে। আমরা তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি, ইসতিগফার করছি, তিনি আমাদের ক্ষমা করে দেবেন আর এ দুনিয়ার সত্যিকারের সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্য দান করবেন।

আপনি তাঁকে জানলে তাঁকে ভালোবেসে ফেলবেন।

সালাত আদায়ের জন্য পরিশ্রমের দরকার নেই। বরং তাঁকে জানার জন্য পরিশ্রম করুন। সালাত তো এমনিই ঠিক হয়ে যাবে। তাঁকে ভালোবাসলে সালাতকেও ভালোবেসে ফেলবেন।

---

৮৪. সুরা নুহ, ৭১ : ১০-১২।

ভালোবাসায় ভরা উপসংহার

প্রত্যেক আলো-সন্ধানীর প্রতি, যে তার আঁধার জীবন আলোকিত করতে চায়।

প্রত্যেক শান্তি-সন্ধানীর প্রতি, যে শঙ্কা কাটিয়ে শান্তির জীবন চায়।

সে মানুষের কাছে এ নিবেদন, যে নিজের ওপর জুলুম করেছে।

যে ক্ষমার বৃষ্টির আশায় আছে, যে বৃষ্টি তাকে সঠিক পথে ফিরিয়ে নেবে।

সালাতের দরজায় ছুটে আসুন... সালাতের দরজা দিয়ে নিজের নফসের সীমাবদ্ধ গর্ত থেকে বেরিয়ে আত্মার আকাশে বিচরণ করার সুযোগ গ্রহণ করুন। আপনি আল্লাহর সান্নিধ্যের অনুপম স্বাদ আস্বাদন করবেন। তাঁর আলোয় আপনার আঁধারে ভরা জীবনকে আলোকিত করতে পারবেন। বিষণ্ন অন্তরে শান্তির দেখা পাবেন। পাবেন মহামহিমের সন্তুষ্টি, যার মাধ্যমে আপনার সব গুনাহ মিটে যাবে নিমিষে।

বন্দিত্বের শিকল ভেঙে সালাতের দরজায় আসা ছাড়া কোনো উপায় নেই। সালাতে এসে নিজেকে দেখবেন একটি নিখুঁত আয়নায়। যে আয়নায় কোথাও ভাঙা থাকবে না, বাঁকা থাকবে না, অস্পষ্টতা থাকবে না। সালাতে আপনার অস্থির দৃষ্টি দিশা পাবে। দৃষ্টি সীমার ওপারে দিগন্তের ওপরে দূরে বহু দূরে চলে যাবে। আপনি সেখানে নিজেকে আবিষ্কার করবেন। অনুভব করবেন, আপনার ভবঘুরে অন্তর এ জীবনের তালাশে ছিল, কিন্তু কখনো তা খুঁজে পায়নি। এখন

তা পেয়েছে। এ অনুভূতির সময়টাতে আপনি নিশ্চিত হবেন, আপনি সালাতে আছেন!

সালাতে সব উদ্বেগ-দুশ্চিন্তা পেছনে ফেলে ডানা মেলে ওপরে রবের অভিমুখে যাত্রা আপনার। সে মাহেন্দ্রক্ষণে আপনাকে স্বাগত জানাতে আসমানের দরজা খোলা হবে। অন্যদিকে ইবলিস তখন সে আলো থেকে পালানোর চেষ্টায় থাকবে। এ আলো পুরো দিগন্তে ছেয়ে যাবে। অস্তিত্বের সবটুকু কেঁপে কেঁপে উঠবে। আসমানের দিকে প্রবল তৃষ্ণায় চেয়ে থাকবেন আপনি। এরপর প্রভুর দয়ায় আত্মা ও অন্তর সিক্ত হবে ভালোবাসার বর্ষণে।

এখন আপনি একাকিত্ব ও লাভ-লোকসানের গোলকধাঁধাকে পেছনে ফেলে ইমানের প্রস্রবণে এলেন। অগ্রসর হচ্ছেন রবের নৈকট্য অর্জনের দিকে তাঁর জিকিরের মাধ্যমে। এবার আপনার জামা মেলে ধরুন তাঁর দরজার সামনে, আঁজলা ভরে নিতে থাকুন। ইবাদতের পেয়ালা থেকে পান করুন আলো, শান্তি ও ক্ষমার শরবত। সাবধান ভুলেও দৃষ্টি সরাবেন না, দৃষ্টি সরালেই দানের প্রবাহ সরে যাবে, বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা।

খুশুময় সালাত আদায়কারী কী করে সে নিয়ামত থেকে মুখ ফেরাতে পারে, যেখানে সবকিছু পেরিয়ে সময়কে হারিয়ে সর্বোচ্চ সৌন্দর্যের তালাশ করতে করতে এসেছে সে। তাই সে নিয়ামত থেকে ক্ষণিকের জন্য দৃষ্টি ফেরানোও অকল্পনীয়। এমনকি খুশুময় সালাত আদায়কারীর জন্য উদ্ভাসিত আলো ছেড়ে অন্য কিছু নিয়ে ক্ষণিকের ভাবনাও অনেক পীড়াদায়ক। আপনার অন্তর গ্রহণ করার জন্য উন্মুক্ত। তার একটি মুহূর্তও বিফলে যেতে দেবেন না। গ্রহণ করুন প্রভুর কাছ থেকে যত পারেন, গ্রহণ করুন সালাতে যত পারেন। সালাতে মহান দাতা আপনার অভিমুখেই রয়েছেন, তাকিয়ে আছেন আপনার দিকে।

কোনো ফেরেশতার মাধ্যম ছাড়াই সালাতের ইবাদত আসমানে সরাসরি প্রদান করা হয়েছে নবি ﷺ-কে। যেন ইবাদতপ্রেমীরা স্বাধীনভাবে আকাশে উড়তে পারে। তাই অটল থাকুন, এ পবিত্রতা ধরে রাখুন। নদীর পাশে রোপিত গাছের ডালও বেড়ে ওঠে। যদি নদীর পানি নাও পায়, তবুও নদীর মৃদু বাতাস আর স্রোত-প্রবাহের মোহনীয় শব্দ তো পায়-ই। লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হাসিলের পথে

আগুনের বাধা থাকে, সে সবকিছু ধৈর্যের বৃষ্টিই নেভাতে পারে। ইবাদতে অটলতা আসে আল্লাহর কাছে বিনয়ের সাথে প্রার্থনার কারণে।

সুরা ফাতিহার আশ্চর্য ক্ষমতা। এর সাথে মিশে আছে অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষা। এটি আপনার শরীরের ক্লান্তি ও অবসাদকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে। আমরা আল্লাহরই ইবাদত করি, তাঁর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি।

এরপর আপনি নিজেকে জাগরিত পাবেন, সে সত্তার নৈকট্য অনুভব করবেন, যাঁর ক্ষমতা ও বড়ত্বের নিদর্শন ছড়িয়ে আছে পুরো দুনিয়ায়। এভাবে আপনার সব ভয়-শঙ্কা দূর হবে, আপনি প্রশান্ত হবেন।

এ প্রশান্ত আত্মা তখন আল্লাহকে পাওয়ার আনন্দে চোখ থেকে অশ্রু ঝরাবে। আল্লাহর দান ও নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা আদায়ে আল্লাহর প্রশংসায়, তাঁর স্তুতিতে, তাঁর গুণগানে অন্তরের ডালপালাকে প্রসারিত করবে। এরপর বান্দার সারা শরীর আনন্দে উদ্বেলিত হবে, কারণ সে তার রবের জবাব অনুভব করতে পারবে। সে আল্লাহর নৈকট্যে সিক্ত হবে, প্রশান্তির ঝলকানি পড়বে তার বিপদগ্রস্ত ডালের ওপর, সে তখন ভয় ও আশার মাঝখানে থাকবে। তখন প্রশান্তি তার পাশের প্রশস্ত সমভূমিকে খুলে দেবে, তার সংকীর্ণতা দূর হবে, বান্দা সেখান থেকে যত ইচ্ছে প্রশান্তি গ্রহণ করবে।

তখন সিজদায় যাওয়ার জন্য মন আনচান করবে। খুশুপূর্ণ দুচোখ নিয়ে সিজদাস্থল পর্যবেক্ষণ করবেন। মালিকের বড়ত্ব আপনার মনে প্রসারিত হবে আর আপনি তখন তাঁর রাজত্বে বিচরণ করবেন। এমনকি পুরো অস্তিত্ব সে বড়ত্বের প্রশংসায় উদ্বেল হবে। এমতাবস্থায় কোনো অন্তর আল্লাহর ভয়ে ভীত ও ভঙ্গুর না হয়ে থাকতে পারে না। এমন অবস্থাতেই মহান আল্লাহর বড়ত্বের সামনে সকল কঠিন হৃদয় গলে গিয়ে কোমল মোমে পরিণত হয়। তখন আপনার প্রবল ইচ্ছা জাগবে আল্লাহর ভয়ে তাঁর সামনে অবনত হওয়ার জন্য। তখন আপনি আল্লাহর উদ্দেশে রুকুতে পড়বেন।

রুকুতে গিয়ে আল্লাহর বড়ত্বের সামনে আপনার সকল অহংকার ও গর্ব ভেঙে খানখান হয়ে যাবে। তখন নিজেকে সংশোধন করার অনুশীলনে আশ্রয় পাবেন। এ অনুশীলন রবের সামনে ঝুঁকে রবকে শ্রদ্ধা জানানো, তাঁর বড়ত্ব স্বীকার

করে নেওয়ার অনুশীলন। যত দীর্ঘ রুকু হবে, তত বেশি আপনি আল্লাহর মারিফাতের নানা দিগন্তে আরোহণ করতে পারবেন।

হৃদস্পন্দন তখন অনেক ধীর, অনেক সূক্ষ্ম গতিতে এসে ঠেকবে। তখন হৃদয়ের ওপর থেকে বিভ্রান্তির অন্ধকার দূর হয়ে যাবে। তার ওপর ভয়ের মৃদু হাওয়া ছড়িয়ে যাবে। আপনার শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেন কেঁপে কেঁপে উঠবে ভয়ের মৃদু হাওয়ার ঝোঁকে। হঠাৎ করে মহান প্রভুর বড়ত্ব ও মাহাত্ম্যের উপলব্ধিতে যেন আপনার নিশ্বাস দ্রুত হয়ে উঠছে।

এবার আপনি প্রশংসা ও স্তুতি মুখে, নিয়ামতের সবটা স্বীকার করে সুন্দর করে উঠে দাঁড়াবেন। এদিকে আপনার নিশ্বাস আবারও দ্রুত হয়ে উঠবে রবের সব নিয়ামতের যথার্থ কৃতজ্ঞতা আদায় করতে না পেরে। তখন আপনার মন উতলা হয়ে থাকবে আরও বেশি প্রশংসা করার জন্য, আরও বেশি কৃতজ্ঞতা আদায়ের জন্য, উতলা হয়ে উঠবে সিজদায় যাওয়ার জন্য। তখন মনে হবে যেন এক উজ্জ্বল আলো আপনার সিজদাস্থলকে আলোকিত করে রেখেছে। মাটি যেন স্বর্ণে পরিণত হয়েছে। আপনি তখন সাকিনা ও প্রশান্তির বেষ্টনীর ভেতরে ধুরু ধুরু বুকে আল্লাহর সামনে সিজদায় লুটিয়ে পড়বেন।

এবার এলেন রবের একেবারে নিকটে। সবচেয়ে নিকটতম স্থানে। নৈকট্যের সিঁড়ি বেয়ে যত ওপরে পারেন উঠে যান; যেন ক্ষমার বৃষ্টি আপনাকে পূর্ণরূপে সিক্ত করে দিতে পারে। এভাবে আপনার সফরের সকল কষ্ট মুছে যাবে। দানের সরোবরে অবগাহন করবেন আপনি।

এখন আপনি রব্বুল আলামিনের সবচেয়ে নিকটবর্তী। এখন আপনি এমন অবস্থায়, যেখানে সময় ও স্থানের কোলাহল কোনো ক্ষতি করারই সুযোগ পায় না। সালিকিনের কাফেলা থেকে বিচ্যুত হে বিপথগামী, এমন একটা সিজদার স্বাদ তো চেখে দেখো, দেখো কত বড় নিয়ামত থেকে তুমি প্রতিদিন বঞ্চিত হচ্ছ। সকল খেল-তামাশা, গর্ব-অহংকার ছেড়ে আসো তোমার মাওলার সামনে। সিজদায় পড়ে কিছু সময় কাটাও। তুমি এখানে এমন কিছু পাবে, যার বর্ণনা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

এরপর রবের সামনে মাথা তুলবেন আপনি। মাথা তুলবেন কেবল। চোখ ওপরে তুলবেন না। কারণ মহামহিম এখনো আপনার দিকে সরাসরি তাকিয়ে আছেন। মহান রবের সামনে বসুন—যিনি অহংকারীদের দমিয়ে দেন, দাম্ভিকদের অপমানিত করেন। বান্দার উচিত হচ্ছে তার মাওলার সামনে আদেশ-নিষেধ মান্য করে খুশুর সাথে উপস্থিত হওয়া।... কিন্তু আল্লাহ... মহা করুণাময়... আপনি যখন গুনাহগার হয়েও দুই সিজদার মাঝখানে তাঁর সামনে বসবেন, তিনি আপনাকে এমনভাবে গ্রহণ করবেন, যেন আপনি বোরাকে চড়ে আসমান পাড়ি দিয়ে তাঁর কাছে গমন করেছেন।

আপনি তখন ক্ষমার কথা চিন্তা করতে থাকুন... স্মরণে রাখুন এটা... ভাবতে থাকুন... দুআ করুন... হে রব, আমাকে ক্ষমা করুন... হে রব, আমাকে ক্ষমা করুন... যখন আপনি আগ্রহে ভরপুর হবেন, তখন আবার ডানা মেলে রবের সবচেয়ে নিকটে চলে যান... মহান আল্লাহকে সিজদা করুন।...

আপনার ধুকধুক করতে থাকা অন্তরে মহান আল্লাহ তাঁর সৌন্দর্য ও মাহাত্ম্যের ঝলকানি দেবেন। তাঁর প্রশংসা করার অনুমতি দেবেন। আহ! কত বড় দান! কত বড় অনুগ্রহ! আত-তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াস সালাওয়াতু ওয়াত তাইয়িবাত ...। এরপর আপনি মহান দয়াময়ের বন্ধুকে সালাম দেওয়ার অনুমতি পাবেন। আস-সালামু আলাইকা আইয়ুহান নাবি...। এরপর আসবে সালাত শেষের সালাম। এ সালাম আপনার অন্তরের ডানায় আগুন জ্বালিয়ে দেবে। আপনি আবারও আসমান থেকে নেমে আসবেন জমিনে।

কত সুন্দর সালাত এ পবিত্র বান্দার! আল্লাহর কাছে গেল। তাঁর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি চাইল। বিপথগামীদের আসর থেকে, দুনিয়াকামী মাতালদের থেকে নিজেকে সরিয়ে এনে সালাতে এসেছিল। প্রশান্ত আত্মার বাহনে চড়ে সে এত দূরত্ব পাড়ি দিয়েছে, যে দূরত্ব পাড়ি দিতে তার হাজারো জীবন লেগে যেত, কিন্তু সে সালাতে সহজেই ওই দূরত্ব পাড়ি দিল। অতঃপর বরকতময় কাফেলার সাথে রুকু-সিজদায় গিয়ে রবের নৈকট্য হাসিল করল।

والله الموفق والمستعان

একটা সময় ছিল, আমি নিয়মিত মুসল্লি হওয়ার তামান্না করতাম। আমি বুঝতে পারতাম, আমি যদি সালাতে নিয়মিত হতে পারি তবে আমার জীবন সৌভাগ্য ও প্রশান্তিতে ভরে উঠবে। সালাতে নিয়মিত হতে পারেনি এমন অনেকেই আমাকে জানিয়েছে, তারাও অন্তরে এমন তামান্না লালন করেন। কিন্তু কীভাবে আমি নিয়মিত মুসল্লি হবো?

সালাতের ব্যাপারে যত চিন্তা, সংশয় ও সমস্যা আপনাকে ঘিরে আছে, সবগুলো নিয়ে চমৎকার আলোচনা হয়েছে এই বইতে। বইটি পড়ার সময় মনে হবে, আরে! এটি তো বিশেষভাবে আমার জন্য লেখা হয়েছে। যেন লেখক আপনাকে অনেক দিন থেকে চেনেন। বইটির পাতা উল্টাতে উল্টাতে আপনার মনে হবে লেখক আপনাকে ধীরে ধীরে নিয়ে যাচ্ছেন সালাতের সুখময় ভুবন। বইটি শেষ হতে না হতেই সালাতের প্রতি অনুরাগ ও ভালোবাসায় ভরে উঠবে আপনার হৃদয়।

দিনের পর দিন প্রতীক্ষায় থাকি, কবে আল্লাহর পক্ষ থেকে সেই অনুগ্রহ আসবে; কবে আমি সালাতে নিয়মিত হব! এদিকে একের পর এক সালাত ছুটে যেতে থাকে। দিন যায়, রাত আসে, সপ্তাহ গড়ায়, মাস ফুরোয়, বছর ঘুরে... কিন্তু সালাতে নিয়মিত হওয়ার তাওফিক আমার হয় না।

বলুন তো এমন কেন হয়? কেন আমরা সালাতের অলসতা কাটিয়ে উঠতে পারি না?

কিছু মানুষ কীভাবে নিয়মিত সালাত আদায় করে? তাদের সালাত ছুটে না, আমার কেন ছুটে যায়?

তারা কি আল্লাহর বিশেষ কোনো বান্দা? আপনার মনেও যদি এই প্রশ্নগুলো আসে, তবে এই বইটি আপনার জন্য...

হ্যাঁ, শাইখ ইসলাম জামাল রচিত (فاتتني صلاة!) গ্রন্থের সরল অনুবাদ 'আমার সালাত ছুটে গেল!' বইটির কথাই বলছি আপনাকে।

সালাত নিয়ে লিখিত অনন্যসাধারণ এই বইটিতে আপনার জন্য রয়েছে চমৎকার কিছু উত্তর!...